কামাল পাশা

ও

নব্য তুরস্ক

শ্রীহরিদাস মজুমদার সম্পাদিত

অন্যান্য বই

১। মায়ের শিক্ষা

২। আচার্য্য জগদীশ-প্রসঙ্গ (সচিত্র)

৩। মহর্ষি দধীচি

৪। সোণা ঠাকুর

এই সমস্ত বই অমৃত পাব্লিশিং হাউজ্

ও

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

কামাল পাশা ও নব্য তুরস্ক

শ্রীহরিদাস মজুমদার সম্পাদিত

অমৃত পাব্লিশিং হাউজ্
৬ নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা

নিবেদন

বিংশ শতাব্দীর অধিনায়কত্বের ইতিহাসে কামালপাশার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—ইহা প্রায় সকল রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রাই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এশিয়ার নবজাগরণের অন্যতম কেন্দ্র তুর্কীস্থান হইতে জাগরণের যে হিন্দোল দিকে দিকে প্লাবিত হইয়াছে তাহার পশ্চাতে ছিল কামালপাশার ব্যক্তিত্ব। তুর্কীজাতির ভাগ্যবিধাতা কামাল পাশার জীবন-কাহিনী তাই জানিবার মতন, বুঝিবার মতন। ইসলাম সভ্যতার প্রাচীন রীতিনীতি বর্জ্জন করিয়া স্বদেশবাসীকে নবজীবনের আস্বাদ যিনি দিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কীর্ত্তিকথা শুধু যে তাঁহার দেশবাসীদের আলোচ্য তাহা নহে, সকলেরই অধিকার আছে এই অধিনায়কের চরিত-কথা আলোচনা করিবার—বিশেষ করিয়া ভারতের।

জাতীয়তার জয়চ্ছত্র উড়াইয়া যে কার্ত্তিমান পুরুষ সমগ্র এশিয়ার বুকে গণতন্ত্রের এক অভিনব আদর্শ স্থাপনা করিয়াছেন তাঁহার চরিত্র ও কার্য্যকলাপ পাঠে যদি কোন ভারতীয়ের মনে এমনি উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। ইতি—

নারায়ণপুর কলোনি,
দমদম।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

উৎসর্গ

সোদরপম শ্রীমান হুমায়ুন কবীরকে—

প্রশস্তি

"এই যে এসিয়ার আকাশের উপরে তুর্কির বিজয়পতাকা উড়ছে, সেই পতাকাকে যিনি সকল রকম ঝড়ঝাপটের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন—সেই দূর-দর্শী, বীর, সেই রাষ্ট্রনেতার পরলোকগত আত্মাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি যে কেবল তুর্কিকে শক্তি দিয়েছেন তাতো নয়, সেই শক্তি-রথের চক্রঘর্ঘর ভারতবর্ষের ভূমিকেও কাঁপিয়ে তুলছে। একটা বাণী এসেছে তাঁর কাছ থেকে, তিনি বুঝিয়েছেন যে, সংকল্পের দৃঢ়তার কাছে, বিরাট অধ্যবসায় ও অক্ষুণ্ণ আশার কাছে, দুরূহতম বাধাও চিরস্থায়ী হোতে পারে না। এই কামালপাশা একদিন নির্ভয়ে দুর্গমপথে যাত্রা করেছিলেন। সেদিন তাঁর সামনে পরাভবের সমূহ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সংকল্পকে তিনি কখনও বিচলিত হোতে দেননি। য়ুরোপের উদ্যত নখদন্ত-ভীষণ সিংহকে তার গুহার মুখেই তিনি ঠেকিয়েছেন। এসিয়াকে এই হোলো তাঁর দান—এই উৎসাহ।

তুর্কিকে তিনি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেইটেই সব চেয়ে বড়ো কথা নয়, তিনি তুর্কিকে তার আত্মনিহিত বিপন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন। বুদ্ধির গৌরবে অন্ধতাকে দমন করা তাঁর সব চাইতে বড়ো মহত্ত্ব, বড়ো দৃষ্টান্ত।

তুর্কিকে স্বাধীন করেছেন বলে নয়, মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র দিয়েছেন বলেই কামালের অভাবে আজ সমগ্র এসিয়া শোকার্ত্ত। সমস্ত এসিয়ার সম্মুখে যিনি প্রগতির পথ উদঘাটিত করেছেন, যার জয়গৌরবের ইতিহাস সমস্ত এসিয়া মহাদেশের বিজয় সূচনা করচে, সেই মহাবীর কামালের উদ্দেশে ভারতের নবযুগের অভিবাদন আমরা প্রেরণ করি।"

রবীন্দ্রনাথ

নব্য তুরস্কের প্রথম সভাপতি কামাল আতাতুর্ক

প্রাচীন তুরস্ক

কামাল পাশার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে তুরস্কের ইতিহাস ও তাহার জাতির অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস বুঝিতে হয়। একাদশ শতাব্দীতে আরবদের হস্ত হইতে সারসান সাম্রাজ্য ওটোমান তুর্কীদের অধীনে আসে। তাহারা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলিম জগতের ভাগ্যনিয়ন্তা হইল। ক্ষাত্রধর্ম্ম তাহারা পালন করিতে লাগিল —আরব, মৌলবী ও মোল্লা, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সাধনা করিত। প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া ওটোমান সাম্রাজ্য দক্ষতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল—সুদূর রোম পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের রাজ্যের বিস্তার সাধন করিয়াছিল। অনেক শাসননিপুণ তুর্কী ভূপতি ও শাসনকর্ত্তা অনেক প্রকার জনহিতকর কার্য্য করিয়া সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতকে ইউরোপে খৃষ্টান জাতিদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কদের গৌরব ম্লান হইতে লাগিল। যাযাবর জাতি সিংহাসনে বসিয়া অসির মর্য্যাদা বিস্মৃত হইল। বিলাস ও ব্যসনে ইহাদের নৈতিক অবনতি ঘটিল; ফলে তুর্কীর সুলতান স্বেচ্ছাচারিতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন।

রাজা স্বেচ্ছাচারী হইলে একদল অনুগ্রহজীবী তাঁহার সিংহাসনের ছায়ায় গজাইয়া ওঠে। সুলতানের পক্ষে তাহারা

তাঁহার উদ্দামতার সেবক কিন্তু প্রজার পক্ষে এই অনুগ্রহজীবীরা হয় ভীষণ আশঙ্কা ও উদ্বেগের স্রষ্টা। রাজকোপ অপেক্ষা ইহাদের প্রতাপ সাধারণের কাছে আতঙ্কজনক। মিথ্যা অপযশ প্রচার ইহাদের অস্ত্র; কাহারও অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা হইলেই তাহারা সুলতানের নিকট গুপ্ত অভিযোগ করিত। স্বেচ্ছাচারীকে সন্দেহ ও আতঙ্কের মধ্যে বাস করিতে হয়। মাঝে মাঝে তাহাকে সিংহাসনচ্যুতির এবং গুপ্তহত্যারও স্বপ্ন দেখিতে হয়। দশজন লোকে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে, কোন যোদ্ধা জনপ্রিয় হইলে, কোন রাজপুরুষ প্রজারঞ্জন করিলে সুলতানের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইত। কাজেই রাজকীয় সকল পদে চাটুকার ও অত্যাচারী অধিষ্ঠিত হইত। রাজ্যে কাহারও জীবন নিরাপদ ছিল না, কাহারও সম্পত্তি নিরুদ্বেগে ভোগ করিবার আশা থাকিত না, যদি না সে রাজপুরুষদের পূজা করিতে শিখিত।

ঠিক যে মাত্রায় তুর্কীর অধঃপতন হইতে লাগিল সেই মাত্রায় খৃষ্টীয় শক্তির উন্নতি হইতে লাগিল। ইহারা নবীন উৎসাহে তরুণ আশায় সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিল। তুর্কীর খৃষ্টীয় প্রজারা মাথা নাড়া দিয়া অনেকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনতা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে লাগিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে তুরস্ক ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের তুলনায় অনেক পিছনে পড়িল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সে সুপ্ত নগণ্য শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপে ব্যক্তিত্বের প্রসার হইল। মানুষে মানুষে সমান, কোন মানুষ কাহারও অধীনে থাকিবে না; ছোট বড় কেউ নয়—এই চিন্তার

ধারা পাশ্চাত্যের মনোরাজ্যে এক ভীষণ বিপ্লব-বন্যার সৃষ্টি করিল। ইংলণ্ডে এই সমস্যার কথঞ্চিত মীমাংসা হইয়াছিল। পূর্ব্বাবধি তাহার বিচিত্র পার্লামেণ্ট ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে উচ্চাসনে বসাইয়া এক দিগ্বিজয়ী স্বাধীন জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকার উপনিবেশে সে জাতির ভিন্ন শাখার স্বাধীনতা ও সাম্যবোধ তাহাদের মাতৃভূমি হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিল।

ভীষণ বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হইল ফরাসী দেশে। শক্তি হিসাবে ফ্রান্স তখন খুব বড় হইয়াছিল। কিন্তু তাহার শাসনযন্ত্র ইংলণ্ডের মত সাম্য ও স্বাধীনতার পোষক ছিল না। ফরাসী জাতি উন্মত্ত হইয়া উঠিল। স্বাধীনতার সংগ্রামে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নামে অনেক ব্যভিচার ঘটিল। নররক্তে দেশ প্লাবিত হইল, কিন্তু নূতন ভাবধারা জগতের সকল পুরাতন বিশ্বাসকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইল।

ফরাসী বিপ্লবের কালে তুর্কীর সুলতান ছিলেন তৃতীয় সেলিম। তরুণ ভাবধারা তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিল। ইউরোপের অনেক পিছনে তুরস্ক, একথা তিনি উপলব্ধি করিলেন। সমাজ ও শাসনযন্ত্রের তিনি সংস্কারকামী হইলেন। উৎকোচ বন্ধ করিলেন, গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করিলেন। মানুষের জন্মগত অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে রাজকর্ম্মচারীবৃন্দকে আদেশ করিলেন প্রাচীনের সহিত নবীনের প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। প্রজাপ্রাণ সেলিম অত্যাচারী রাজপুরুষদের হস্তে নিহত হইলেন। সংস্কারের স্রোত আবার রুদ্ধ হইল।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সেলিমের সিংহাসন অধিকার করিলেন দ্বিতীয়

মাহমুদ। তাঁহার সময়ে জানিজারী রক্ষিসৈন্য (Ganissaries) প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। মাহমুদ বুঝিলেন তুরস্ক সাম্রাজ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার অনুষ্ঠিত না হইলে তুর্কীর নাম লোপ পাইবে। রাশিয়া ও শ্লাভজাতির চাপে পড়িয়া তুর্কী নিস্পেষিত হইবে। সেলিমের মত করুণ হৃদয় লইয়া তুর্কী সৈন্য ও রাজপুরুষদের অনিবার্য্য বাধা প্রতিরোধ করা অসম্ভব। যে দুর্দ্দমনীয় রাজশক্তির সংস্কারে মাহমুদ ব্রতী, হইলেন, সেই দুর্দ্দমনীয়তার দ্বারাই তিনি নবীন তুর্কী গড়িবার সঙ্কল্প করিলেন। জানিজারী বীরেরা রাজশক্তির নিকট নতশির হইতে কুণ্ঠাবোধ করাতে সুলতান তাঁহার সমগ্র বাহিনীকে হত্যা করেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আবদুল মজিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বুঝিলেন, উপযুক্ত সহযোগী না পাইলে, জনহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বৃথা। তিনি রসিদ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। রসিদ পাশা লণ্ডন ও প্যারিসে তুরস্কের প্রতিনিধিরূপে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন, তিনি ইউরোপের দুইটী প্রধান রাষ্ট্রের কার্য্যক্রমও বিশেষরূপে অবগত ছিলেন এবং স্বদেশের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগও ছিল।

রসিদ সংস্কারের মূল-সূত্র ধরিলেন। মানুষের প্রাণ ও সম্পদ স্বেচ্ছাচারিতার কবল হইতে নিরাপদ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তখন তুর্কীতে প্রজার জীবনের কোন মূল্যই ছিল না। রাজপুরুষের স্বেচ্ছাচারিতাই কেবলমাত্র জনগণের ভয়ের কারণ ছিল না। রাজ্যময় গুপ্তচরের প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহাদের লোভ প্রজাদের

পরম ভয়ের কারণ ছিল। ভয় দেখাইয়া অর্থ-শোষণ করা ছিল ইহাদের একটি পেশা। তাহার উপর নির্দ্দিষ্ট কোন লিপিবদ্ধ আইন ছিল না। কাজেই প্রজামাত্রেই অসন্তুষ্ট ও শঙ্কিত থাকিত। কর বা শুল্কের কোন নির্দ্দিষ্ট সমতামূলক ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষাও বাধ্যতা-মূলক ছিল না। এমন কি শ্রমশিল্পে উন্নতির পরিকল্পনা অবধি ছিল না।

ধীর ও শান্তভাবে সুলতান আবদুল মজিদ নিজের জীর্ণ সাম্রাজ্যের সংস্কারে ব্রতী হইলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার তিনটী বিচক্ষণ স্বদেশপ্রেমিক সহায়ক জুটিয়াছিল—রসিদ পাশা, আলি পাশা ও মুরাদ পাশা। ইঁহারা প্রত্যেকেই জীবন পণ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনী ও রাজপুরুষদের বিরোধিতা, শিষ্ট ও শান্তভাবে প্রায় ইঁহারা নির্ম্মূল করিলেন। আবদুল মজিদ ফতোয়া দিলেন, সুলতানের চক্ষে তুরস্কের সকল প্রজা সমান। তুরস্ক সাম্রাজ্যে মুসলমান ও অ-মুসলমানের কোন পার্থক্য থাকিবে না। ধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা ইসলামের ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে সুলতানের এই সার্ব্বভৌম পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত হয় নাই; সংস্কারবিরোধী উলেমা কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া তিনি তাঁহার পরিকল্পনাকে সমগ্রভাবে রূপ দিতে সক্ষম হন নাই।

১৮৬১ সালে তিনি দেহরক্ষা করিলে সুলতান আবদুল আজিজ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। দেশে সংস্কারের ধূম পড়িলে প্রত্যেক স্বদেশভক্ত এবং চিন্তাশীল নরনারী নিজ নিজ আদর্শ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া নব্য তুর্কী নামে একদল সংস্কারব্রতী শিক্ষিত তুর্কী স্বদেশসেবার আয়োজন

করিতেছিল। নবীন তুর্কীর নেতারা প্যারিসে বসিয়া নিজেদের সাম্রাজ্যের হিতের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করিবার একমাত্র উপায় তাঁহারা উদ্ভাবন করিলেন—সকল শ্রেণীর প্রজার প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত শাসন-পরিষদ। তুরস্কে পার্লামেণ্টের পদ্ধতিতে রাষ্ট্র শাসিত হইলে দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ফিরিবে—এই আদর্শ লইয়া নব্য তুর্কীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইল।

আবদুল মজিদ ফতোয়ার দ্বারা সাম্রাজ্যে অত্যাচার দমন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু আসলে রাজাজ্ঞা অপ্রতিহত রাজশক্তির একটি বিকাশ মাত্র। প্রকৃত প্রয়োজন রাজশক্তিকে গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা। রাজপরিষদে প্রজার প্রতিনিধি দ্বারা তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। নবীন তুর্কী চাহিল শাসন-পরিষদ, নির্ব্বাচন ও প্রজার সম্ভ্রম। সুলতান আবদুল আজিজ গণতন্ত্রের সোপান রচনা করিবার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবার মত মানসিক শক্তি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। ওদিকে ওসমানিয়া যুবকদলের একটি সমিতি গঠিত হয়। ইহা Society Of The Young Ottomans, তরুণ ওটোমান সমিতি নামে অভিহিত হইত। উক্ত সমিতি পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচার দ্বারা অধিবাসীদিগকে নিয়মতন্ত্র দাবী করিতে উত্তেজিত করে। দেশের মধ্যে রাজদ্রোহিতা আবার প্রধূমিত হইল, অশান্তির সৃষ্টি হইল। নব্যতুর্কী ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে আজিজকে সিংহাসনচ্যুত করিল। সিংহাসন হারাইয়া আজিজ আত্মহত্যা করিলেন। সুলতানের আত্মহত্যা নবীন তুর্কীর মনোরথ বিফল করিল।

১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে আবদুল হামিদ সুলতান বলিয়া ঘোষিত

হইলেন। ১৮৭৬ সনের ৩১শে আগষ্ট সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হামিদ শাসন-সংস্কারে ব্রতী হন। নব্য তুর্কীর আশা ভরসা মদৎ পাশা প্রধানমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইউরোপীয় শক্তির ইঙ্গিত অনুসারে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য ১৮৭৬ সালের শেষভাগে একটি পরামর্শ সভার বৈঠক হয় এবং সমগ্র তুরস্ক সাম্রাজ্যের জন্য পার্লামেণ্ট গঠন স্থিরীকৃত হয়। মদৎ পাশা ফরাসী রাজ্যের অনুকরণে শাসন-পরিষদের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। ১৮৭৬ সনের ২৩শে ডিসেম্বর সুলতান এই খসড়া অনুমোদন করিলে প্রথম পার্লামেণ্ট উদ্বোধনের আয়োজন হয়। কিন্তু রাজকোষের শোচনীয় অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা সংস্কারের প্রতিকূল হওয়ায় সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে না হইতেই উহা স্থগিত করা হয়।

হামিদ ছিলেন চতুর ও কুচক্রী। হাস্যমুখে তিনি প্রথমে ঘোষণা করেন যে, অতঃপর আইনসঙ্গত নবীন তন্ত্রে তুরস্ক সাম্রাজ্য শাসিত হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করিতে গিয়া তিনি মদৎ পাশার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। বুঝিলেন, এ কণ্টক না তুলিতে পারিলে সিংহাসন নিরাপদ থাকিতে পারে না। পার্লামেণ্ট ব্যর্থ হওয়ার অজুহাতে তিনি মদৎ পাশাকে পদচ্যুত ও তুরস্ক হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

এই সময়ে কনষ্ট্যান্টিনোপলে শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধি সকল সমবেত হইয়া প্রস্তাব করেন যে, আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা তদারক জন্য একটি কমিশন গঠিত হউক এবং রাশিয়া, সার্ব্বিয়া ও বুলগেরিয়ার জন্য (শক্তিপুঞ্জের অনুমোদন লইয়া) সুলতান কর্তৃক একজন গভর্ণর

নিযুক্ত হউক। কিন্তু সুলতান ইহাতে রাজী না হওয়ায় ১৮৭৭ সালের ২৪শে এপ্রিল রাশিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং রুমানিয়া রাশিয়ার সহিত যোগদান করে।

তুরস্কের অর্থকৃচ্ছ্রতা, আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও অরাজকতার অজুহাতে ইউরোপীয় কোন শক্তি সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইল না; প্লেভনা রণক্ষেত্রে বীরবর ওসমান পাশা অসীম-সাহসিকতার পরিচয় দেওয়ায় সমগ্র ইউরোপ তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিতে থাকে। কিন্তু অবশেষে তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৮৭৮ সালের ১৩ই জুলাই বার্লিনে সন্ধিবৈঠক বসে। উহার ফলে তুরস্কের ভাগ-বণ্টন আরম্ভ হয়। সার্ভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। রুমানিয়া ও মন্টিনেগ্রো বর্দ্ধিত রাজ্যের অধিকারী হয়। অষ্ট্রিয়ার অংশে বোসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ইংলণ্ডের অংশে সাইপ্রাস দ্বীপ, ফ্রান্সের অংশে টুনিশ ও রাশিয়ার ভাগ্যে বাতুম, কার্স ও আর্দাহান পড়ে। সুলতান আর্ম্মেনিয়ান-দিগকে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইলেন।

বার্লিনসন্ধির কিছুকাল পরে ১৮৭৮ সনে সুলতান আবদুল হামিদ শাসন-তন্ত্রের সংস্কার ও পুনর্ব্যবস্থার জন্য ইউরোপ হইতে অনেকগুলি অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করেন, কিন্তু কিছুদিন বাদেই তাহাদিগকে বিদায় দিয়া পার্লামেণ্ট বন্ধ করেন ও সংস্কারপ্রবর্ত্তক প্রধানমন্ত্রী মদৎ পাশাকে নির্ব্বাসিত করেন। আর্ম্মেনিয়ানগণ বহুদিন পূর্ব্ব হইতে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিল, এখন তাহারা বিদ্রোহ অবলম্বন করিল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে প্রধান সংস্কারক মদৎ পাশার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। অত্যাচারী

হামিদের কুটীল সন্দিগ্ধ মন ইতিপূর্ব্বেই মদতের বিরুদ্ধে হিংসার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। এখন গুপ্তপুলিশের সংগৃহীত প্রমাণে তিনি মদৎ পাশাকেই ভূতপূর্ব্ব সুলতান আজিজের হত্যাকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বিচারকেরা মদৎ পাশার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন।

দেশময় হাহাকার উঠিল। কুচক্রী হামিদ সন্ত্রাসিত হইলেন। তিনি করুণা দেখাইয়া মদতের প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার করিলেন। তাহার পরিবর্ত্তে মদতের যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা হইল। তিনি তায়েফের অন্ধকূপে বন্দী হইলেন। প্রকাশ, এই অন্ধ কারাগারেই তাঁহাকে গলা টিপিয়া মারা হয়। মাদাম হালিদা তাই বলিয়াছেন,—"মদৎ পাশার মত একজন অতি মহাপ্রাণ স্বদেশ-ভক্ত, স্বদেশপ্রেমের জন্য মানবসাধ্যের সর্ব্বাধিক মূল্য দিয়াছেন।"

মদৎ পাশার মৃত্যুর পর দেশের চারিদিকে অরাজকতা উপস্থিত হয়। ইতিপূর্ব্বে সুলতান হামিদ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ ও গোয়েন্দাজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে নব্য তুর্কীদল ক্ষেপিয়া উঠিল।

তুরস্কে আবার দমননীতির যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। অত্যাচার, অনাচার এবং গুপ্তচর প্রজাকে পদে পদে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। প্রথম সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক জাতীয়তাবাদী • গণতন্ত্রের পোষক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। "ইব্রেত" তাহাদের মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কাগজ। চণ্ডনীতি একে একে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ করিল। দাঁতের উপর দাঁত পিষিয়া তুর্কীর লোক এইসব অত্যাচার নীরবে সহ্য করিল।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেনিয়ান ও কুর্দ্দ জাতির মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। সুলতান আর্ম্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে কুর্দ্দ জাতিকে উত্তেজিত করেন। উহার ফলে, আর্ম্মেনিয়ানগণ সুলতানের জীবন-পিপাসু হইয়া ওসমানিয়া ব্যাঙ্ক আক্রমণ করে। পূর্ব্বেই নব্যতুর্কীদের মধ্যে জাগরণের উদয় হইয়াছিল, এখন আর্ম্মেনিয়ানগণ তাহাদের সহানুভূতি পাইল। ম্যাসিডোনিয়াবাসীরাও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল। তাহারাও নব্য তুর্কীদলের সহিত যোগদান করিল। ইতিমধ্যে গুজব উঠিল যে, ইংলণ্ড ও রাশিয়া তুরস্ককে বণ্টন করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র। নব্য তুর্কীদল উহা শুনিতে পাইয়া চির-দিনের জন্য তুরস্ক সমস্যা সমাধান করিবার মানসে ম্যাসিডোনিয়ার সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া একটি গুপ্তসমিতি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা সুলতানের প্রতিকূলে দাঁড়াইল। স্যালোনিকা সহরে Committee of Union and Progress—ঐক্য ও অগ্রগতি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার ইহাই আদি কথা। আনোয়ার বে প্রমুখ কয়েকজন উর্দ্ধতন সামরিক কর্ম্মচারী এই গুপ্তসমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

নব্য তুর্কীগণ পুরাতন শাসনপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া সংস্কার-মূলক শাসন প্রবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইল। সমগ্র ইউরোপ তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য উৎসুক রহিল। সুলতান তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন। তাহাদিগের প্রতিপত্তি সমূলে উৎখাত করিবার জন্য কাহাকেও বন্দী, কাহাকেও নির্ব্বাসিত করিলেন। নব্যদল ইহাতে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা বুঝিতে পারিল, সৈনিকবিভাগের সাহায্য

ব্যতীত তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। স্বতঃই সুযোগ উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ বহুদিবস যাবত বেতন পায় নাই; অন্যদিকে আলবেনিয়াবাসী করভারে জর্জ্জরিত, আবার শক্তি-পুঞ্জের কার্য্যপ্রণালীতে মোসলেমমাত্রই মর্ম্মাহত ছিল। সুতরাং বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য "ইউনিয়ন ও প্রোগ্রেস কমিটি" অগ্রসর হইল; এবং স্যালোনিকা নব্যতুর্কীদের কেন্দ্রস্থল মনোনীত হইল। ইহার অধিকাংশ সভ্যই সামরিকবিভাগে কার্য্য করিতেন। আলবেনিয়া ও ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য মেজর আনোয়ার বে ও নিয়াজি বে ভারগ্রহণ করিলেন। সমরবিভাগের অধিকাংশই সংস্কারকদিগের মত ও পথ অবলম্বন করিল।

১৯০৮ সনের ২রা জুলাই নিয়াজি বে সৈন্যসহ মোনাস্তিয়ের পথে রেজনা নামক স্থানে বিদ্রোহপতাকা উত্তোলন করিলেন। ২৩শে জুলাই "ইউনিয়ন ও প্রোগ্রেস কমিটি" আনোয়ার বে'র নায়কত্বে স্যালোনিকা নগরে নিয়মতন্ত্র স্থাপন করিলেন এবং সৈন্যদল কনষ্ট্যান্টিনোপলে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইল। ২৪শে জুলাই সুলতান আতঙ্কিত হইয়া স্থগিত নিয়মতন্ত্র পুনঃপ্রচলন করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন ও পার্লামেন্টের ডেপুটী মেম্বর নির্ব্বাচনের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সেই সঙ্গে বন্দী তুর্কী যুবকদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং গোয়েন্দাগিরি বন্ধ করিয়া দিলেন। মুদ্রাযন্ত্র ও প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিবার বিরুদ্ধে যে সকল কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও প্রত্যাহার করিলেন। ৬ই আগষ্ট উদারনৈতিক কিয়ামিল পাশা প্রধানমন্ত্রী

নিযুক্ত হইলেন এবং একজন গ্রীক, একজন আর্ম্মেনিয়ানবাসী, শেখুল ইসলাম ও অন্যান্য ডেপুটী লইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইল।

ইহার পর ১৯০৯ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী "ইউনিয়ন ও প্রোগ্রেস কমিটির" বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। "জমিয়তে মোহম্মদী" নামক একখানি সংবাদপত্র রাজতন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করে এবং Liberal Union (উদারনৈতিক সমিতি) নামক সম্মিলনী কমিটীর বিপক্ষে দাঁড়াইল। অশিক্ষিত জনসাধারণ উলেমা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া কমিটির বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। যাহা হউক, আলবেনিয়াবাসীগণ কমিটির পক্ষ সমর্থন করে। উহাদের সাহায্যে নব্য তুর্কীদল পার্লামেণ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করিল। তাহার পর প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে, তওফিক পাশা ১৪ই এপ্রিল তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। অবশেষে কমিটির সহিত মিটমাট করিতে সম্মিলনী জমিয়ত ও অন্যান্য দল প্রতিনিধি পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে সুলতান আবদুল হামিদ বিদ্রোহীদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। কিন্তু কমিটি মনে করিল, সুলতানের প্রতিরোধ হেতু নিয়মতন্ত্র কখনও নিরাপদ হইবে না। সুতরাং প্রতিনিধিদিগের সহিত মিটমাট করিতে অস্বীকার করিয়া কমিটি পঁচিশ হাজার সৈন্য মামুদ সফকত পাশার নায়কত্বে কনষ্ট্যান্টিনোপলে প্রেরণ করিল।

২৫শে এপ্রিল পাঁচ ঘণ্টা অবিরত যুদ্ধের পর সফকত পাশা ইস্তাম্বুল অধিকার করিলেন। তাহার পর জাতীয়সভা দুই দিবস যাবত গোপনে বৈঠক করে এবং সকলেই একমত হইয়া

সুলতানের আশু সিংহাসনচ্যুতি এবং তাঁহার স্থলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই রেশাদ আফেন্দীকে নিয়োগের জন্য ভোট প্রদান করিল। হিলমী পাশা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। সুলতান আবদুল হামিদ বন্দী হইয়া স্যালোনিকায় প্রেরিত হইলেন। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে বলকান যুদ্ধে স্যালোনিকা গ্রীকদের হস্তগত হইলে আবদুল হামিদ কনষ্ট্যান্টিনোপলে নীত হন এবং সেখান হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত ম্যাগনিসিয়া নামক পল্লীতে স্থানান্তরিত হন। এইখানেই ১৯১৮ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৯০৯ সালের ৫ই আগষ্ট সুলতান রেশাদ আফেন্দী নূতন পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন। এই পার্লামেণ্ট রাজস্ব ও শাসন-সংক্রান্ত সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নব্য তুর্কীদল সুলতান আবদুল হামিদকে বন্দী করিয়া স্যালোনিকার দূরবর্ত্তী পল্লীতে নির্ব্বাসিত করেন। তাঁহার পর তাঁহার ভাই রেশাদ আফেন্দী ৫ম মোহম্মদ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সুলতান আবদুল হামিদ ইঁহাকে ত্রিশ বৎসর বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং নব্য তুর্কীদলের সহিত ইঁহার প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ছিল। কেবল মোসলেম বহির্জ্জগতকে তুষ্ট রাখিবার জন্য সুচতুর নব্য তুর্কীদল আবদুল হামিদের সিংহাসনচ্যুতি ও ৫ম মোহম্মদের খেলাফত ঘোষণার পোষকতায় শেখুল ইসলাম হইতে ফতোয়া বাহির করিয়া লইয়াছিল। তালাত বে, জামাল বে, আনোয়ার বে নব্যতুর্কীর নেতা ছিলেন। ওসমানিয়া সাম্রাজ্যে পাশ্চাত্য আদর্শে

আধুনিক নিয়মতন্ত্র প্রবর্ত্তন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে স্বদেশানুরাগ ও উৎসাহ যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু শাসন কার্য্যে ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল না। যাহা হউক, সাধারণ নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হইল, নূতন পার্লামেণ্ট সংস্কারমূলক ব্যবস্থা লইয়া ব্যতিব্যস্ত রহিল।

অমিতব্যয়িতা ও অর্থাভাব হেতু তখন লোকের নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল। অবিশ্বাস ও গোয়েন্দাগিরি রাজকর্ম্মচারী-দিগকে উৎকোচে বশীভূত করিয়াছিল। বেতন অনাদায় থাকায় অনেককে শুধু বখ্‌শিশের উপর নির্ভর করিতে হইত। অপরদিকে বহু প্রতিপত্তিশালী কর্ম্মচারীগণকে নব্যতুর্কীর সহিত কল্পিত সহানুভূতির অপরাধে জবাব দেওয়া হইত। সামরিক বিভাগের অবস্থাও শোচনীয় ছিল। শত শত কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারী সন্দেহ হেতু দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। এদিকে জনসাধারণ করভারে নিপীড়িত, তাহাতে শিক্ষার অভাব, চলাচলের অসুবিধা, শিল্প ও বাণিজ্য আর্ম্মেনিয়ানদের হাতে ন্যস্ত। চারিদিকে অশান্তি, অরাজকতা বিদ্যমান।

তুরস্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, বৈদেশিক সম্বন্ধও তথৈবচ। তুরস্ককে তল্পীতল্পা লইয়া ইউরোপ হইতে বিদায় দেওয়াই ছিল ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের মতলব। জাতিশত্রু “জার” তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান রাজ্যকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। এ্যাসকুইথ প্রমুখ ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-নেতারও তুরস্ককে কোন প্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এই অবস্থায় নব্য তুর্কীদল সংস্কারসাধনে বড়ই হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছিল। সামরিক গঠনে হস্তক্ষেপ না করিতেই ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালী তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। আনওয়ার বে'র নায়কত্বে আরব ও তুর্কী-সৈন্য ত্রিপলী রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ইতালীর বিরুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ত্রিপলী ইতালীভুক্ত হইল। লণ্ডনের সন্ধিবৈঠক আলবেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। এইরূপে যে সকল দেশ তুরস্ককে সৈন্য ও কর্ম্মচারী সরবরাহ দ্বারা সাহায্য করিত, সেই সকল দেশ একে একে তুরস্কের অঙ্গচ্যুত হইল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বলকান চুক্তিপত্র গ্রীক, বুলগেরিয়া ও সার্ব্বিয়া কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। যে সৈন্যশক্তি বহু শতাব্দী ধরিয়া তুরস্কের গৌরব ছিল, তাহা চূর্ণীকৃত হইল। ১৯১৩ সনের ৩০শে মে তুরস্কের অদৃষ্টে শীলমোহর পড়িল,—ভাগবণ্টন শেষ হইল। অতঃপর বণ্টন লইয়া আপোষে গোল বাধিল। তুরস্কের এই সময়ের অবস্থা মাদাম হালিদা এদিব এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"Men were foaming at the mouth with excitement." সমগ্র জাতি এক অপূর্ব্ব উত্তেজনায় অধীর ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রুমানিয়া বুলগেরিয়া আক্রমণ করিল। এই সুযোগে নব্যতুর্কী আড্রিয়ানোপোলকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইল। রাশিয়ার ইচ্ছা ছিল না যে দার্দ্দানিলিস ও কনষ্ট্যান্টিনোপল বলকান শক্তির দ্বারা অধিকৃত হয়। সুতরাং তুরস্কের পক্ষে সুবর্ণসুযোগ ঘটিল। ১৯১৩ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর বুখারেষ্ট-সন্ধির সর্ত্তানুসারে বুলগেরিয়াকে যুদ্ধলব্ধ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইল।

ম্যাসিডোনিয়া হস্তগত হওয়ায় তুরস্কের মর্য্যাদার বিশেষ হানি হয়। ম্যাসিডোনিয়ার কৃষকশ্রেণী বহু পরিমাণে আনাতোলিয়ায় হিজরত করিয়াছিল। এই দুঃসময়ে নব্য তুর্কীদল খেলাফতের দোহাই দিয়া রাশিয়া ও ভারতবর্ষের মোসলেম অধিবাসীদিগের নিকট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করে এবং উহা দ্বারা তাহারা দুইটি যুদ্ধজাহাজ খরিদ করে।

তুরস্কের এই দুর্দ্দিনে ১৯১৪ সালে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাযুদ্ধের আরম্ভ হয়। নব্যতুর্কীর নেতৃগণ জার্ম্মাণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাম্রাজ্যকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করিল। ১৯১৮ সনের ৩০শে অক্টোবর মুড্রসদ্বীপে আমেরিকার মধ্যবর্ত্তিতায় যুদ্ধ-বিরতিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বহু শতাব্দীর সংগ্রামের ফলে এই সময়ে তুরস্ক যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল, তাহা চুরমার হইয়া গেল। এইরূপে ৫ম মোহম্মদের রাজত্বকালেই সুলতানের শক্তি লুপ্তপ্রায় হইল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৫ম মোহম্মদের মৃত্যু হইলে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভাই যুবরাজ ওয়াহিদ উদ্দীন নব্য তুর্কীদলের অনুমোদন ক্রমে ৬ষ্ঠ মোহম্মদ নামে সিংহাসন লাভ করেন। নামে মাত্র সিংহাসন, কেননা এই সময়ে সুলতানের আর পূর্ব্বের ন্যায় শক্তি ও প্রতাপ ছিল না। ইঁহার রাজত্বকালে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও আমেরিকার রণপোতসমূহের আনুকূল্যে গ্রীক সৈন্য স্মার্ণায় অবতরণ করে এবং মিত্রশক্তির পূর্ণদৃষ্টিপথে ১৫ই মে তাহারা বর্ব্বরতা ও হত্যার স্রোত প্রবাহিত করিয়া স্বীয় অধিকারের পূর্ণ অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

গ্রীকসৈন্য স্মার্ণা অধিকার করিয়া পরবর্ত্তী জুলাই মাসে পূর্ব্ব থ্রেসে প্রবেশ করিল। ১৯২০ সনের ১০ই আগষ্ট মিত্রশক্তিত্রয় কর্ত্তৃক "সেভার-সন্ধি" স্বাক্ষরিত হইল। ইহার ফলে তুর্কীর বৈদেশিক প্রভুত্ব সমূলে বিনষ্ট হয়। ইউরোপে কনষ্ট্যান্টিনোপল ও তাহার নিকটবর্ত্তী ভূভাগ ব্যতীত তুরস্কের আর কিছু রহিল না। এশিয়ায় আর্ম্মেনিয়া ও কুর্দ্দিস্থান তুরস্কের হস্তচ্যুত। আরব, ইরাক, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া প্রদেশে বৈদেশিক প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। মিশর, ত্রিপলী ও তুনিসের উপর তুরস্কের দাবী রহিত হইল। এতদ্ভিন্ন তুরস্কের সৈন্য সংখ্যার পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট করা হইল। সেভারসন্ধি স্বাক্ষরিত হইলে সমগ্র তুরস্ক শোকের চিহ্ন ধারণ করিল, দোকানপাট বন্ধ হইল, সমগ্র রাজ্য বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন হইল।

ইতিপূর্ব্বেই মিত্রশক্তির দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া মুস্তাফা কামাল ১৯২০ সনের এপ্রিল মাসে এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত আঙ্গোরায় আসিয়া জাতীয় মহাসমিতির (Grand National Assembly) ভিত্তি পত্তন করেন।

মহাসমরের ফলে নব্যতুর্কীদলের সকল আশা চিরতরে মিটিয়া যায় এবং আনোয়ার পাশা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তুরস্ক হইতে প্রস্থান করেন। এইবার মুস্তাফা কামাল সুযোগ পাইলেন। ইতিমধ্যে দার্দ্দানিলিস অভিযানে সাফল্য লাভ করিয়া তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করেন। সে কাহিনী অন্যত্র বলিব।

সেভারসন্ধি স্বীকার করিয়া ৬ষ্ঠ মোহম্মদ তুরস্ককে পৃথিবীর বক্ষ হইতে চিরবিদায় দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঠিক

এইসময় তুরস্কের রাষ্ট্রে কামাল পাশার আবির্ভাব। প্রথম প্রচেষ্টাতেই তিনি এই সর্ব্বনাশকর সেভারসন্ধি রদ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অগণিত গ্রীকবাহিনীর সম্মুখীন হইয়া মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে কামাল সাকারিয়া নদীর তীর হইতে উহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। গ্রীকবাহিনী পরাজয় স্বীকার করিয়া পলাইতে বাধ্য হইল। কামালের দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ ইসমেৎ পাশা অগ্রসর হইলেন। ইস্‌কি সহর, আফির্ডাস, কারা হিসার প্রভৃতি স্থানে গ্রীকশত্রু যে সকল কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল, তুর্কী একে একে তাহা পুনরধিকার করিল। পরাজিত গ্রীকসৈন্য আক্রোশে গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া অবশেষে স্মার্ণায় পৌঁছিয়া জাহাজযোগে স্বদেশে প্রস্থান করিল। কামালের বীরত্ব দর্শনে জগত স্তম্ভিত হইল ও শক্তিপুঞ্জও সন্ধির জন্য উদগ্রীব হইল। অবশেষে ১৯২২ সনের ২০শে নভেম্বর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লুসান-সন্ধির (Lausane) বৈঠক হয় এবং ১৯২৩ সনের ২০শে জুলাই বহু বাদানুবাদের পর উক্ত সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

ইহার ফলে পূর্ব্বে থ্রেস ও আড্রিয়ানোপল তুরস্কের অন্তর্ভূক্ত হইল। ১৯২০ সনের ২০শে এপ্রিল আঙ্গোরায় জাতীয় মহাসভা যে চুক্তিপত্রের মুসাবিদা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সকল সর্ত্তই লুসান কনফারেন্সে গৃহীত হয়।

এদিকে ১৯২০ সনের ২০শে জানুয়ারী মুস্তাফা কামাল আঙ্গোরায় সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করেন। ১৯২২ সনের ৪ঠা নভেম্বর জাতীয় মহাসমিতি কনষ্ট্যান্টিনোপলের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৭ই নভেম্বর ৬ষ্ট মোহম্মদ সুলতান ওয়াহিদউদ্দিন বৃটিশ

জাহাজে চড়িয়া কয়েকটি মাত্র পরিজনসহ ইউরোপে প্রস্থান করেন। তাহার পর সুলতান আবদুল আজিজের পুত্র আবদুল মজিদ আফেন্দী খলিফা নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি সর্ব্বপ্রকার রাজশক্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। এইরূপে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের বহু শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদের যবনিকা পতন হয়। ইক্‌বাল আসীশা সুলতানের সিংহাসন ত্যাগ এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন: "He left in the darkness secretly anp with but a newspaper parcel of valuables frenziedly placed together in the few unhappy moments which seperated a decision to flee and an uncontrolable urge safely to quit Turkish soil."
"সুলতান রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করিলেন। নিরাপদে তুরস্ক ত্যাগ করিবেন কি সেখান হইতে গোপনে পলায়ন করিবেন এই চিন্তার দোদুল্যমান মুহূর্ত্তে তিনি অতি সামান্যই ধনসম্পত্তি হস্তগত করিতে পারিয়াছিলেন।"

১৯২৪ সনের ২রা মার্চ্চ জাতীয় মহাসমিতি খেলাফতও উঠাইয়া দিলেন এবং খলিফা আবদুল মজিদ সুলতানের অবশিষ্ট পরিজনসহ ইউরোপ যাত্রা করেন। তাহার পর ১৯২৪ সনের ২০শে এপ্রিল মুস্তাফা কামাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্ধত মিত্রশক্তি সভয়ে প্রাচ্যের এই বিজয়গৌরব লক্ষ্য করিয়া ভ্রূকুটি-কুটিল চক্ষে শেষবারের মত তুরস্কের পানে চাহিয়া দেখিল— দেখিল, অগণিত প্রজাপুঞ্জের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া প্রাচ্যের নব জাগরণের অগ্রদূত, বিজয়ী বীর কামাল পাশা!

নব্য তুর্কীদল

তুরস্কে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এত বড় একটা শান্তিময়, রক্তহীন বিপ্লব চক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গেল। সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই ঘটনায় স্তম্ভিত হইল। নব্য তুর্কীর এই জাগরণ নবীন এশিয়ার আত্মবৈশিষ্ট্যের আর এক সমুজ্জ্বল উদাহরণ। তুরস্কের অবস্থা অন্য দেশের অবস্থা নয়। দুর্ব্বল, অত্যাচার-পীড়িত রাষ্ট্র কেমন করিয়া বিনা রক্তপাতে অন্তরে-বাহিরে রূপান্তর সাধন করিয়া আবার নবজীবনের অধিকারী হইতে পারে তুরস্কের জাতীয়-দল তাহাই সিদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছেন। নব্য তুরস্কের এই নেতৃমণ্ডলের বীর্য্য, মনুষ্যত্ব, দেশপ্রেম, গভীর চিন্তাশক্তি, উদ্যম ও কর্ম্মপটুতা সমস্তই অনুকরণীয়। স্বৈরাচারী আবদুল হামিদ জিঘাংসু শক্তিপুঞ্জের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি স্বরূপ ছিলেন। কূট চক্রান্তই তাঁহার নীতি, গুপ্তচর বিভাগই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল। এইরূপ হীন ষড়যন্ত্র বিধানে তিনি যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে এইটুকু কৃতিত্বের ভাগী করিতে পারা যায় যে, তাঁহার চক্রান্তের ফলে তুরস্ক খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ইউরোপের মানচিত্র হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। তুরস্কের জাতীয় দল যে নব বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই অপমানকর নীতির প্রভাব হইতে জাতিকে মুক্তি

দিতেই চাহিয়াছে। নবীন তুরস্কের নেতৃগণ নির্ভীক, দৃঢ়চেতা, স্পষ্টভাষী। এই সকল গুণই জাতীয় চরিত্রে বল বিধান করে, জাতিকে উন্নতি ও মুক্তির ঋজুপথে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য দেয়। তুরস্কের জাতীয় তন্ত্র এই সাধন-বীর্য্য লইয়াই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার আশা-আকাঙ্খা, তাহার নবজীবন লাভের অমর প্রেরণা, তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার অদম্য সঙ্কল্প এক শক্তিমান পুরুষকে আশ্রয় করিয়া এই সময়ে আত্ম-প্রকাশ পূর্ব্বক সমগ্র জাতিকে নিশ্চিন্ত করিল। ইনি যুগমানব কামাল আতাতুর্ক।

যে প্রাচ্য জাতির অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয়পতাকা একদিন ভিয়েনার তোরণোপরি সগর্ব্বে উঠিয়াছিল, সমগ্র ইউরোপের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে একে একে তাহার বিরাট বাহু ছিন্ন হইয়া যখন ক্রমেই সংকীর্ণ ও জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল; যখন ইউরোপের খ্রীষ্টান সমুদ্রে তুরস্ক গোষ্পদতুল্য স্থান অধিকার করিয়া ইউরোপের "রুগ্ন মানুষ" (Sick man of Europe) এই ঘৃণাব্যঞ্জক আখ্যা অর্জ্জন করিয়া কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া সঙ্কটময় দিন গণিতেছিল; তাহার পর জার্ম্মাণীর মিত্ররূপে পাশ্চাত্যের কুরুক্ষেত্রে নামিয়া কাইজারের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহারও ভাগ্য অধঃপতনের চরম স্তরে গিয়া পৌঁছিল, তুরস্ককে তখন নিশ্চিহ্ন করিতেই শক্তিপুঞ্জ কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল। এই ঘোর দুর্দ্দিনে, উদীয়মান সূর্য্যের মত, এই প্রাচ্য বীরের অভ্যুত্থান অন্ধকার দূর করিয়া তুরস্কের প্রাণে সত্যই নবশক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। আজ তুরস্ক আর জগতে কাহারও উপেক্ষার বস্তু নয়, ঘৃণার বস্তু নয়, অবজ্ঞার পরিবর্ত্তে

বিশ্বের দরবারে সম্মান আদায় করিয়া লইতে নব্য তুরস্ক আজ বীরকণ্ঠে দাবী করিতে পরাঙ্মুখ নয়। কামালের কণ্ঠে নবীন তুরস্কের সিংহগর্জ্জন আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মুখে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে।

সুলতান আবদুল হামিদের উপর শক্তিপুঞ্জের সর্ব্বদা খরদৃষ্টি ছিল এবং ওসমানিয়া সাম্রাজ্যকে খণ্ডীকৃত করিয়া প্রত্যেকেই এক এক টুকরা উদরসাৎ করিতে উদগ্রীব হইয়াছিল। রাশিয়া, দার্দ্দানেলিস প্রণালী দিয়া কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগর মধ্যে বাণিজ্যের যোগাযোগ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট ছিল। অষ্ট্রিয়াও স্যালোনিকা বন্দর দিয়া ভূমধ্যসাগরে যাতায়াতের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। জার্ম্মাণী তুরস্কের উপর আর্থিক প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ব্যগ্র ছিল; ইতালী ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া ত্রিপলী আক্রমণ কররার জন্য উদ্যত ছিল এবং গ্রেট বৃটেন তুরস্ক সাম্রাজ্যের সহিত পণ্যদ্রব্যের আদানপ্রদানের জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল। তুরস্ক কয়লা, তামা, রূপা ও পেট্রোলিয়ম এবং অন্যান্য বহু খনিজ পদার্থের আকর-ভূমি এবং ভবিষ্যতে অর্থপ্রসূ, তাই ইহাকে ভাগ-বণ্টন করিয়া লইতে শক্তিপুঞ্জ লালায়িত ছিল।

উৎপীড়ন ও স্বৈরশাসনের অজুহাত দিয়া তুরস্কের উপর হস্তক্ষেপ করাই সকলের উদ্দেশ্য ছিল, এইরূপ স্বার্থান্ধ শক্তিপুঞ্জের দ্বারা নিগৃহীত হইয়া তুরস্ক কখনও নিঃশ্বাস ছাড়িবার অবসর পায় নাই। ইহার উপর যখন আন্তর্জ্জাতিক চাপ পড়িল, তখন তুরস্ক সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। স্মার্ণা ও অন্যান্য সমুদ্র-তীরবর্ত্তী নগরে গ্রীকগণ উত্তেজনা সুরু করিল। তাহারা তুরস্কের

সামরিক ব্যাপারে যোগদান করিতে নারাজ, আবার আর্ম্মেনিয়ার খ্রীষ্ট প্রজাগণ মোসলেম কুর্দ্দ জাতির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত। অন্যদিকে আরব ও তুরস্কের মধ্যে ঘোর মনোমালিন্য বিদ্যমান। তুরস্কের এই শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া শিক্ষিত তরুণ দল কামাল পাশার নেতৃত্বে মুমূর্ষু তুরস্ককে পুনরুজ্জীবিত করিতে দণ্ডায়মান হইল। নবীন কর্ম্মবীরগণ ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

ঐক্য ও সাম্যর দ্বারা তুরস্কের সমস্ত বর্ণ ও জাতিকে আবদ্ধ করিয়া তুরস্ককে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা এই দলের উদ্দেশ্য ছিল। সকল জাতিকে সমানাধিকার দেওয়া এবং উন্নতি সাধন বা অগ্রগতি দ্বারা তুরস্ককে শক্তিশালী করা তাঁহাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। শিক্ষা ও সৈন্যবল বৃদ্ধি দ্বারা মৃতপ্রায় তুরস্ককে নবজীবন প্রদান করিতে ইঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ইঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় মহাশক্তির সমকক্ষ হইতে হইলে একতা ও অগ্রগতি অত্যাবশ্যক। "ঐক্য ও অগ্রগতি সমিতির" কার্য্যকরী কমিটির কার্য্যসূচী প্রধানতঃ এইরূপ ছিল :—

(১) নূতন নূতন রাস্তা তৈয়ার করা।

(২) রেলওয়ের বিস্তার সাধন করা।

(৩) আবাদি জমির চাষ।

(৪) নূতন বন্দর স্থাপন।

(৫) জল নিস্কাষণের উপায় উদ্ভাবন।

(৬) নূতন জলপথ আবিষ্কার।

(৭) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা।

(৮) শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক কোম্পানীর অনুষ্ঠান।

বর্দ্ধিত শুল্ক ধার্য্য করিয়া দেশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধন করিতে কমিটি প্রস্তাব করিয়াছিল। অবশেষে ইহা স্থির হইল যে, কমিটির পক্ষ হইতে যে সকল ব্যক্তি পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত দাবীর পোষকতা করিবেন :—

(ক) মন্ত্রীসভা, অথবা "Chambers of Deputies," শাসন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(খ) তুর্কীভাষা সমগ্র সাম্রাজ্যের সরকারী ভাষা বলিয়া গৃহীত হইবে।

(গ) সকল জাতির সমানাধিকার থাকিবে।

(ঘ) অমুসলমানগণও যুদ্ধ ব্যাপারে যোগ দিতে বাধ্য থাকিবে।

(ঙ) শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবে।

নির্ব্বাচনের ফলে কমিটির পক্ষে অধিকসংখ্যক ব্যক্তি পরিষদে আসিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, গ্রীকগণ উচ্চপদে আসীন ছিল এবং নির্ব্বাচন ব্যাপারে ইহারা স্বীয় জাতীয় স্বার্থ সাধনে প্রণোদিত হইয়াছিল। যখন সুলতান আবদুল হামিদ তুরস্কে পার্লামেণ্ট উদ্বোধন করিবার জন্য যানারোহণে বহির্গত হইলেন তখন চারিদিক উল্লাসধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল। সমগ্র জগত তুরস্কের কার্য্যাবলী অতীব মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। পার্লামেণ্ট গঠনের পর কেহ কেহ আপত্তি করিলেন যে, মহাসভার পশ্চাতে স্বতন্ত্র কমিটির কোন আবশ্যক নাই, কিন্তু অধিকাংশের মতে স্থির হইল যে, যে পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট দৃঢ় ভিত্তির উপর অবস্থিত না হয়, কমিটি কার্য্যকরী

থাকা আবশ্যক। দেশের শিক্ষিত মোসলেম তরুণ দল সকলেই কমিটিভুক্ত ছিল। কেবল Liberal Union বা উদার নৈতিক সমিতি নামক সম্মিলনী কমিটির প্রতিকূলে দাঁড়াইল। গ্রীকদের অনেকেই এই সম্মিলনীর পক্ষপাতী ছিল এবং ইহারা অর্থ সরবরাহ করিতে লাগিল। অন্যদিকে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ খৃষ্টীয় জাতির প্রতি নিপীড়নের অজুহাতে তুরস্ককে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়াছিল। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থসাধন এবং সেই উদ্দেশ্যে বলকান ষ্টেটকে সাহায্য প্রদান করা হইত।

এইরূপ প্রতিযোগিতার মধ্যে তুরস্কের পুনরুদ্ধার জন্য কমিটিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কমিটির বিরুদ্ধবাদীরা প্রকাশ করিল যে, ইউনিয়ন ও প্রোগ্রেস কমিটির মেম্বর ও সৈনিক কর্ম্মচারীগণ কোরআনের আদেশ প্রতিপালন করেন না। ইহাতে জনসাধারণ বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কমিটির বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। ফলে, যে আত্ম-বিপ্লবের সৃষ্টি হইল, তাহাতে নব্যতুর্কীদলের বহুলোক হত ও আহত হইল এবং অনেকেই জীবন লইয়া পলায়ন করিল।

এই সংবাদে স্যালোনিকায় মোসলেম, খৃষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায় ক্ষেপিয়া উঠিল। কনষ্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করিবার যুক্তি আঁটিল। আনোয়ার বে, হক্কী বে এবং "ইউনিয়ন ও প্রোগ্রেস" কমিটির অন্যান্য পলাতক সভ্যগণ আবার স্যালোনিকা আসিয়া পৌঁছিলেন। সমগ্র ম্যাসিডোনিয়া কমিটির সাহায্যে সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইল। বুলগেরিয়া ও আলবানিয়ার নেতৃবৃন্দ ইহাদের সহিত যোগদান করিলেন। কেবল গ্রীকগণ দূরে রহিল।

কনষ্ট্যান্টিনোপলে সংবাদ পৌঁছিল যে, ম্যাসিডোনিয়াবাসী কনষ্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করিতে উদ্যত। স্থলতান ইহা অবগত হইয়া প্রধানমন্ত্রী তওফিক পাশার সহিত বারংবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি নানাভাবে স্থলতানকে অভয় প্রদান করিতে-ছিলেন। স্থতরাং আত্মরক্ষা বা বাধা প্রদানের কোন বন্দোবস্ত করা হইল না। সাকত পাশা বহুসৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষকে হটাইয়া দিয়া কনষ্ট্যান্টিনোপলে প্রবেশ করিলেন। পরে গুপ্তবৈঠকে স্থলতানের সিংহাসনচ্যুতি সম্বন্ধে সকলে একমত হইল। ১৯০৮ সনের ২৪শে এপ্রিল ইস্তাম্বুল, গালাটা ও পেড়া অধিকৃত হইল। তওফিক পাশা ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গ ইস্তফানামা পাঠাইলেন বটে, কিন্তু মন্ত্রীদিগের ইচ্ছানুসারে সাময়িক গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করিতে বাধ্য হইলেন। এইবার নব্যতুর্কী দলের প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। তরুণ দল মনে করিল যে, গোলমালের স্বপক্ষে নিশ্চয়ই স্থলতানের মৌনসম্মতি ছিল, স্থতরাং তাহারা তাঁহার প্রতি আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পরিল না। ২৭শে এপ্রিল সৈয়দ পাশার নায়কত্বে জাতীয় সমিতির গুপ্তবৈঠক বসিল এবং শেখুল ইসলাম কর্ত্তৃক ফতোয়া স্বাক্ষরিত হইল। প্রশ্ন হইলঃ—

যদি এমাম সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করেন, যদি প্রজাবর্গের হত্যা, কয়েদ ও নির্ব্বাসনের পর সংস্কার প্রচলন করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহার বিপরীত আচরণ করেন এবং যদি স্বীয় জাতির মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করেন, যদি ইঁহার পদচ্যুতিতে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ মনে করেন যে

এমামকে সিংহাসন ত্যাগ করান কিম্বা তাঁহাকে পদচ্যুত করা আবশ্যক তাহা হইলে এই দুইটি পন্থার একটি অবলম্বন করা আইনসঙ্গত কিনা ?

উত্তর হইল—হাঁ ।

তাহারপর জাতীয় মহাসমিতি সুলতানের পদচ্যুতি সম্বন্ধে ভোট প্রদান করিল। পার্লামেণ্ট হইতে মন্ত্রীগণ আবদুল হামিদকে পদচ্যুতি সংবাদ ও তাঁহার ভ্রাতা রেশাদ আফেন্দীকে সিংহাসনা-রোহণের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। যে রেশাদ আফেন্দী ভ্রাতার আদেশে ত্রিশবৎসর যাবত বন্দী ছিলেন আজ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থান অধিকার আর আবদুল হামিদ কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্থান গ্রহণ করিলেন।

আনোয়ার পাশা

নব্যতুর্কীদলের নেতৃত্রয়ের পরিণাম বড়ই শোকাবহ। তালাত্ যে বার্লিনে জনৈক আর্মেনিয়ান কর্ত্তৃক নিহত হন। আনোয়ার পাশা তুর্কীস্থানের মরুদেশে প্রোথিত এবং জামাল যে তিকলিসের জনৈক আততায়ী কর্ত্তৃক মৃত্যুমুখে নিপতিত হন।

নব্যতুর্কীর জাগরণের মূলে আসল ব্যক্তিত্ব হইলেন আন্ওয়ার পাশা। প্রসঙ্গক্রমে আমরা ইঁহার সম্বন্ধে দুইএক কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। কৃষ্ণসাগর তীরস্থ "আপনা" নামক স্থানে আনোয়ার যে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা আলবেনিয়া-বাসিনী ও পিতা জনৈক তুর্কী সেতুরক্ষক ছিলেন। আন্ওয়ার পাশা প্রথমে নিম্নস্থ কর্ম্মচারী হিসাবে স্যালোনিকা সহরে সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে স্বীয় প্রতিভাগুণে মেজর ও সমরসচিব পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯০৯ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বার্লিনে অবস্থিতি করিয়া সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। জার্ম্মাণীর সামরিক রীতি-নীতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে এবং কালে তিনি জার্ম্মাণীর পরামর্শে তুরস্কের সামরিক বিভাগ পুনর্গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

স্যালোনিকার কার্য্যস্থানে থাকিতে আনোয়ার তরুণ তুর্কীদলের সংস্পর্শে আসিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে পার্লামেণ্ট গঠিত হইয়া

অব্যবহিত পরেই স্থগিত হয়, তাহা পুনরুদ্ধার করিতে আন্ওয়ার বদ্ধপরিকর হন। তাঁহার নায়কত্বে সাম্রাজ্যের চারিদিকে নূতন আশা ও উদ্দীপনার সূচনা হয়। তিনি সুলতান আবদুল হামিদের স্বৈর-শাসনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। সুলতান নব্যতুর্কীদলের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার অবসর ও সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু নব্যতুর্কীদলকে দমন করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; অবশেষে তিনি নিজেই তাহাদের হস্তে বন্দী হন।

মুস্তাফা কামাল সৈনিকবিভাগে আনোয়ার বে-র কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিলেন, কিন্তু উভয়েরই অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব থাকায় বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপের সাহায্য ব্যতীত তুরস্ককে নবশক্তিতে উদ্দীপিত করা মুস্তাফা কামালের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে তুরস্ককে শক্তিশালী করাই ছিল আন্ওয়ারের অভিপ্রায়। সুলতান বাহিরের শক্তি ব্যতীত তুরস্কের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর মনে করেন নাই। এই জন্যই সুলতানের সঙ্গে মুস্তাফা কামালের মনোমালিন্য ঘটে। মুস্তাফা কামালের দক্ষতা এবং উপযোগিতা জানিয়াও সুলতান আন্ওয়ার বের পক্ষপাতী ছিলেন। কামাল চিরদিন আন্ওয়ার বের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাকে সামরিক বিভাগ হইতে বহিষ্কৃত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আনোয়ার বে ইতালী ও বলকান যুদ্ধে তুরস্কবাহিনীর নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আন্ওয়ার

কামালের সহায়তায় আড্রিয়ানোপল পুনরধিকার করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তদবধি তিনি আনোয়ার পাশা নামে অভিহিত হইতে থাকেন। পরবর্ত্তী বৎসর তিনি তুর্কী গভর্ণমেণ্টের সমর-সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। ক্রমে আনোয়ার তুরস্কের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন।

দ্বিতীয় পার্লামেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মাহমুদ সাকত রাজ্য হইতে বহিস্কৃত এবং নিহত হইলে তরুণ দল ক্ষেপিয়া উঠে এবং বিরুদ্ধ পক্ষকে একে একে সাম্রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে। কথিত আছে, উক্ত দল একদিনের মধ্যে সহস্রাধিক কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়া তাহাদের স্থান তরুণ তুর্কীদ্বারা পূর্ণ করে।

মুস্তাফা কামালের ন্যায় আনোয়ারও দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুইজনেই জীবন-সংগ্রামের প্রথম অংশে সমর বিভাগে প্রবেশ করেন। উদীয়মান কামাল অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইলেও আনোয়ারকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া ঈর্ষ্যা করিতেন। সুলতান কামালের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইতেন না।

প্রকৃতপক্ষে আনোয়ার পাশাই তুরস্কের স্বাধীনতার মূলীভূত কারণ। তাঁহারই প্রশস্ত অন্তঃকরণ দরিদ্র প্রজাদিগের উৎপীড়নে ব্যথিত হইয়াছিল এবং তাঁহারই ইঙ্গিতে কূটরাজনীতিজ্ঞ সুলতান আবদুল হামিদ শাসনভার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইলে আনোয়ার অতি উচ্চ আশা পোষণ করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণ আদর্শই তাঁহার নিকট

ধ্রুব সত্য ছিল। আনোয়ার বিরাট জার্ম্মাণ-বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়া বলকান রাজ্যগুলি বিধ্বস্ত করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। দূরদর্শী কামাল পাশা মহাসমরে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আনোয়ার পাশা, তালাত বে ও জামাল বে মহাসমরের মধ্য দিয়া এক ক্ষমতাশালী নূতন রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন ; তাই তাঁহারা নিজেদের স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্ব লইয়া জার্ম্মাণীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কামালের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিলে রাজশক্তি হস্তচ্যুত হইতে পারে এই আশঙ্কায় কর্ণধারত্রয়ী তাঁহার পরামর্শ উপেক্ষা করিলেন। জার্ম্মাণীর পরাজয়ের সঙ্গে তাঁহাদের সকল আশা সমূলে বিনষ্ট হইল। মহাসমরের শ্মশানে একাকী দাঁড়াইয়া সেদিন তুরস্ককে নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া মিত্রশক্তিবর্গ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়াছিল। কামাল তখন লাঞ্ছিত, অসহায় তুরস্কের একমাত্র আশা ও ভরসা।

ইতিমধ্যে নব্যতুর্কীদল সুলতানের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হয় এবং উহার ফলে কেহবা নিহত হয়, কেহবা পলায়ন করে। আনোয়ার সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অবশেষে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বোখরা নামক স্থানে জনৈক আতাতায়ীর গুলিতে নিহত হন।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এইখানে আনোয়ার ও কামাল-চরিত্রের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করিলাম। বয়সে কামাল আনোয়ার অপেক্ষা এক বৎসরের বড় ছিলেন, কিন্তু সামরিক বিভাগে কামাল ছিলেন আনোয়ারের নিম্নতম কর্ম্মচারী।

দুইজনের মধ্যে যথেষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক মতানৈক্য ছিল। তাঁহারা সর্ব্বদাই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছিলেন। দুইজনেরই শরীরে আলবানিয়ার রক্তধারা বর্ত্তমান থাকায় তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে প্রতিযোগীর ভাব সর্ব্বদাই একজনকে অপর হইতে দূরে রাখিত। দুইজনেই ক্ষমতাগর্ব্বিত, প্রবল মানসিক-শক্তি সম্পন্ন ও অভিমানী ছিলেন। তাঁহাদের কেহই বিরুদ্ধ পক্ষের সমালোচনা অথবা বাধা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের উভয়েরই শারীরিক ও মানসিক নির্ভীকতা প্রসিদ্ধ এবং তাঁহারা যাহা চিন্তা করিতেন, স্পষ্টভাবে তাহা ব্যক্ত করিতেন। এ ছাড়া তাঁহাদের চরিত্রে আর কোনো সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইত না।

আনোয়ার আদর্শবাদী এবং পরিকল্পনাপ্রয়াসী ছিলেন। আদর্শের বৃহত্ব তাঁহাকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত যে তিনি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতেন না। বস্তুতান্ত্রিকতা তাঁহার প্রকৃতিতে আদৌ ছিল না।

অন্যপক্ষে কামাল ছিলেন একজন পুরাদস্তুর বস্তুতান্ত্রিক এবং অতিমাত্রায় হিসাবী ও সাবধানী। আদর্শের মরীচিকার প্রতি তিনি কখনও ছুটিতেন না। বড় বড় আদর্শ ও বাক্যসার কল্পনা তাঁহার নিকট মূল্যহীন ছিল। কামাল যে কোনো জিনিষ ধরিতেন, ধীর মস্তিষ্কে আনুপূর্ব্বিক তাহা বিচার করিয়া দেখিতেন। তিনি বাস্তবতার কঠিন পথে চলিতে ভালবাসিতেন। তুরস্ক ভিন্ন, অন্য কোন দেশ বা অন্য কোন বৈদেশিক শক্তি সম্বন্ধে কামাল মাথা ঘামাইতেন না। তুরস্ক ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন দেশের চিন্তা তাঁহার মনের মধ্যে কখনও স্থান পাইত না।

আনোয়ার বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার মন সর্ব্বদাই উৎসাহে ভরপূর থাকিত। আত্মবিশ্বাসী কামাল ছিলেন সর্ব্বদাই গম্ভীর প্রকৃতির নীরব মানুষ। বেশী লোকজনের সহিত তিনি কথাবার্ত্তা বলিতে ভালবাসিতেন না। বিলাসিতা তাঁহাকে কোনো দিন আশ্রয় করিতে পারে নাই।

উদীয়মান কামাল

মাদাম হালিদা এদিব লিখিয়াছেন, "গণতন্ত্রমঞ্চে কামালের ব্যক্তিত্ব অতি বিরাট। তিনি বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষ, তুরস্ককে শত্রুহাত হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় উহাকে জাগরিত করা একমাত্র তাঁরই কার্য্য।" কামালের শারীরিক বৈশিষ্ট্য তাঁহরা দুইটি চক্ষে—বাঘের মত তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল সেই চোখ দুইটির দিকে একবার তাকাইলে সহজেই বোধ হইবে তুরস্কের হৃতগৌরব উদ্ধার করিবার দুঃসাধ্য ব্রত দিয়াই বিধাতাপুরুষ কামালকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কোন কোন সমালোচকের মতে কামালের ব্যক্তিত্বের কয়েকটী গুণের সহিত নেপোলিয়নের চরিত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইজিয়ন সাগরের তীরস্থ স্যালোনিকা নগরে কামালের জন্ম। তাঁহার পিতা আলিরেজা বে সুলতানের অধীনে শুল্ক বিভাগে একটি সামান্য চাকরী করিতেন। তুরস্কের যে অংশ ইউরোপের অন্তর্গত, কামালের মাতাপিতা সেই অংশের অধিবাসী। সুতরাং কামালকে ইউরোপবাসী বলিলেই চলে। ইঁহাদের মেজাজ, চালচলন, বেশভূষা সমস্তই ইউরোপবাসীর মত। আলিরেজা বে সার্বিয়ার সীমান্ত দেশ হইতে স্যালোনিকা নগরে আসিয়া বসবাস করেন। ইনি ওসমানিয়া-

কাঙাল-জননী জুবেদা

তুর্ক ভদ্রবংশসম্ভূতা গৃহস্থ-কন্যা জুবেদাকে বিবাহ করেন। আলি-দম্পতি দরিদ্র হইলেও তাঁহাদের যথেষ্ট মহত্ত্ব ছিল; আলিরেজা অত্যন্ত স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। শুল্ক বিভাগের কার্য্য করিয়া আলি যথানিয়মে বেতন পাইতেন না। অগত্যা তিনি কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করেন। পিতার স্বাধীন চিন্তা আর মাতার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এই দুই সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া কামাল জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র পিতামাতা সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে ধর্ম্ম-যাজকের পদে আসীন দেখিলেই তাঁহারা চরিতার্থ হইবেন মনে করিয়াছিলেন। তাই কামাল বড় হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে স্থানীয় মাদ্রাসায় পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। অন্যদিকে কামালের পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্রকে কোন ব্যবসাতে নিযুক্ত করা; কিন্তু শৈশবেই কামাল পিতৃহীন হন। তখন তাঁহার শিক্ষা ও পরিচর্য্যার ভার মাতার উপরই ন্যস্ত হইল। বীরশিশু কামাল সমগ্র তুরস্কের ভাগ্যবিধাতা হইবার জন্য যে প্রেরিত, পিতামাতা কখনও তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই।

সুলতান আব্দুল হামিদের রাজত্বকালে কামালের জন্ম। সুতরাং তখনকার পরিবেশ তাঁহার ভাগ্য-গঠনের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল বলিতে হইবে। কেননা, তখনকার যে রাষ্ট্র-বিশৃঙ্খলা তাহা তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। আবদুল হামিদের সময়ে রুষের সহিত সুলতানের যুদ্ধ হয়। রুমানিয়া ও সার্বিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। বুলগেরিয়া স্বরাজপ্রাপ্ত হয় এবং বোসনিয়া ও হার্জেগোভিনা অষ্ট্রিয়ার অধিকার-ভুক্ত হয়। সুতরাং

দেশের এই অরাজকতার মধ্যে বালক কামাল লালিত পালিত হন। জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত তুর্কীর হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তুরস্ক সর্ব্বত্র "রুগ্ন" বলিয়া ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইত, বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহ ইহাকে করুণার চক্ষে দেখিত। বালক কামালের হৃদয়ে এই অবমাননার প্রতিঘাত পড়িল। তাঁহার কোমল প্রাণ স্বদেশ-হিতৈষণার জন্য কাঁদিয়া উঠিল। তিনি কাহারও সহিত বেশী কথাবার্ত্তা বলিতে ভালবাসিতেন না। পরিণত জীবনে কামাল স্বল্পভাষী ছিলেন। সেইজন্য অনেকে তাঁহাকে Silent man, নির্ব্বাক পুরুষ বলিয়া থাকে। সদাসর্ব্বদা উদ্বেলিত চিত্তে সময় যাপন করিতেন। মাতা ব্যতীত কাহারও সহিত কামাল স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হন নাই। তাঁহার কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিলে বালক অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেন। শৈশব হইতেই তিনি একরোখা, হামবড়া ও উদ্ধত ছিলেন। বাল্যে তিনি বড় ক্ষীণ ও দুর্ব্বলকায় ছিলেন কিন্তু তাঁহার নীলবর্ণ চক্ষু দীপ্তিময় ছিল। শিশুবয়সেই কামালের বীরোচিত গুণগ্রামে সকলেই আকৃষ্ট হয়। তাঁহার স্থিরদৃষ্টি, দৃঢ় সঙ্কল্প ও নির্ব্বাক স্বভাব তাঁহার বিরাট ভবিষ্যতের পরিচয় প্রদান করিত।

পিতা আলি রেজার মৃত্যুর পর পরিবারবর্গের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। মাতা জুবেদা স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনন্যোপায় হইয়া তিনি কামালকে মেষ-পালক ও আস্তাবলের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কামাল স্বাধীনতা-প্রিয়, সুতরাং স্বাধীনভাবে মেষ চড়াইতে ভালবাসিতেন। এইরূপে বালক এগারো বৎসরে উপনীত হইল। এই সময় তাঁহার মাতুল

তাঁহাকে স্থানীয় মাদ্রাসায় প্রেরণ করিলেন। কামাল এই বিদ্যালয়ে এক বৎসর কাল পড়েন এবং এইখানেই তিনি কোরাণ ও আরবী পড়িতে শিখিয়াছিলেন। তাহার পর স্যালোনিকার উচ্চ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করেন। কামাল অনুশাসন কখনও ভালবাসিতেন না, বড়ই হঠকারী ছিলেন। সকল সময়েই নিজের মতের পোষকতা করিতে ভালবাসিতেন। কেহ তাঁহার মতের বিরোধী হইলে, তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ক্রমে কামাল সকলের অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। একদা জনৈক সহপাঠীর সহিত বিবাদ করায় শিক্ষক তাঁহাকে প্রহার করেন। ইহাতে শিক্ষকের সহিত কামাল দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হন এবং অবশেষে ক্রোধান্ধ হইয়া স্কুল পরিত্যাগ করেন। বালকের এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়া জুবেদার ভ্রাতা বালকের শিক্ষা-ভার গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। মাতা জুবেদা বালককে তিরস্কার করিলেন। বালকও মাতার সহিত বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর জুবেদার ভগ্নীপতি দুর্দ্ধর্ষ বালককে সৈনিকবিভাগে দিবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দুর্দ্দান্ত বালক কোন নিরীহ পেশা অবলম্বন করিবে না। সৈনিক-বিভাগের কঠোরতাই তাহার কঠোর প্রকৃতির অনুযায়ী হইবে। বিশেষতঃ সামরিক শিক্ষা অবৈতনিক, সুলতান স্বয়ং উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেন। সৈনিক-বিভাগে বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিলে বালক ভবিষ্যতে গৌরবময় পদের অধিকারী হইতে পারিবে।

কিন্তু কামালের মাতা এই প্রস্তাবে সায় দিলেন না। কামাল

মাকে কত বুঝাইলেন এবং জনৈক প্রতিবেশী যুবকের সহিত পরামর্শ করিয়া সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বালকের প্রতি ধমনীতে তুর্কীর উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত ছিল। তাই কামাল বীরোচিত পেশাই পছন্দ করিলেন। তাহার পর একদিন মাতাকে না বলিয়া এবং কাহারও পরামর্শ না লইয়া কামাল জনৈক বন্ধুর সাহায্যে স্যালোনিকার সামরিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিলেন। কামাল অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। কোন সহপাঠী তাঁহার সহিত যোগ দিতে সাহস করিত না। কামাল সকলকে হীন চক্ষে দেখিতেন এবং স্বয়ং মাতব্বর বলিয়া পরিগণিত হইতে ব্যগ্র থাকিতেন।

সতের বৎসর বয়সে কামাল স্যালোনিকার সামরিক স্কুল পরিত্যাগ করিয়া ইস্তাম্বুলের সামরিক কলেজে প্রবেশ করিলেন। কামালের ভবিষ্যত জীবনের উন্মেষ এই সময় হইতেই ধীরে ধীরে দেখা দেয়। উৎসাহী যুবক, ভাবপ্রবণ হৃদয় এবং দেশের কল্যাণ করিতে সমুদ্যত শক্তি এই তিনের একত্র মিলন হইলে মানুষের দুঃসাধ্য কিছুই থাকে না। কামাল ইস্তাম্বুলে আসিয়া এমন এক প্রেরণা পাইতে লাগিলেন, যাহাতে তাঁহার অন্তরের ঘুমন্ত শক্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি যেন হঠাৎ আপনাকে চিনিয়া ফেলিলেন। এই সময় হইতে তিনি রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিতে থাকেন এবং বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। শুধু তাহাই নহে, দেশে রাজনীতিক

প্রসঙ্গ লইয়াও তিনি চিন্তা করিতে সুরু করেন। এক কথায়, এই সময় কামাল নবযুগের ভাব ও চিন্তাধারার সহিত গোপনে গোপনে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, তুরস্কের শাসন-ব্যাপারে বহু গলদ আছে। সেগুলির শীঘ্র সংশোধন না করিলে দেশের উন্নতি হইবে না। সেই সুকুমার বয়সের সময় তাঁহার মনে স্বদেশ-প্রীতির যে আগুন জ্বলিতেছিল তাহা কখনও নিভিয়া যায় নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সাব-লেপ্টেন্যান্টের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। সামরিক বিভাগে কামাল অতিশয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাই শীঘ্রই তিনি ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হন।

সামরিক কলেজে অধ্যয়নের সময় কামাল সহপাঠিদিগের সহিত মিলিয়া এক রাষ্ট্রসমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সমিতি ভবিষ্যতে নব্যতুর্কের জাতীয় দলের বীজ-কেন্দ্র "Committee of Union and Progress" বা "ঐক্য ও অগ্রগতি সমিতি" নামে সুপরিচিত হয়। তুরস্কের নবজাগরণের ইতিহাসে এই সমিতির নাম ও কার্য্যাবলী চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুলতান রাজত্বের চারিদিকে গোয়েন্দার গুপ্তজাল পাতিয়া বসিয়াছিলেন এবং গুপ্ত পুলিস কামালের গতিবিধি ও উক্ত সমিতির কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সামরিক বিভাগে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত ও সরকারী গেজেটে যথারীতি তাহা ঘোষিত হইবার পর কামালের কলেজ ত্যাগ করিবার সময় আসিল। একদিন রাত্রে কামাল ও তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মীগণ যখন এই সমিতির

একটি জরুরী বৈঠকে সমবেত হন এবং ভবিষ্যৎ কার্য্য-পদ্ধতি বিষয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় অতর্কিতভাবে একদল পুলিশ ও একজন এডজুটেণ্ট (Adjutant) আসিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করে। কয়েক মাস কারাগারে থাকিবার পর কামাল মুক্ত হইলেন।

কামাল মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি রহিল। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিলেন যে, কামালই হইতেছেন সমস্ত বিপ্লবের মূল উৎস। সুতরাং এহেন বিপ্লবী যুবককে দেশান্তরিত করিতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। কামালপাশার উপর সুলতানেরও ক্রোধ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তাঁহার নির্দ্দেশে কর্ত্তৃপক্ষ বাছিয়া বাছিয়া বিপদ সঙ্কুল স্থানে কামালকে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। সিরিয়াতে সেই সময় একটি প্রবল গণ্ডগোল চলিতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষ কামালকেই সেনাগণের ক্যাপ্টেনরূপে তথায় প্রেরণ করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, কামালকে ইস্তাম্বুল হইতে দূরে নির্ব্বাসিত করা। শিক্ষায়, সমাজে, রাষ্ট্রে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের প্রকাশ নানা মূর্ত্তিতে দিন দিন প্রবল হইয়া কামালকে সেই অত্যাচারের প্রতিকারে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। সিরিয়াতে আসিয়া কামাল সুযোগ পাইলেন এবং এখানেও কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচরের সহায়তায় "ওয়াতন" নামক আর একটি গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার শাখা-প্রশাখা একাধিক স্থানে স্থাপিত হয় এবং গণতান্ত্রিক শাসনের আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য চারিদিকে প্রচার-কার্য্য চলিতে থাকে।

এই সংবাদ অবগত হইয়া কর্তৃপক্ষ কামালকে দামাস্কে প্রেরণ করিলেন। শাসনকেন্দ্র হইতে দামাস্কের দূরত্ব প্রদর্শন করিয়া কামাল সৈন্যাধ্যক্ষ শুকরী পাশার অনুমতি অনুসারে ম্যাসিদোনিয়াতে চলিয়া আসেন এবং সেখানকার বিদ্রোহদলের সহিত যোগদান করেন। কিছুদিন পরে এখানেও একটি গুপ্তসমিতি গঠিত হয়। কামাল এখান হইতে ছদ্মবেশে স্যালোনিকায় আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। উহার ফলে আরও অনেকগুলি সংঘের সৃষ্টি হয়। পরে এইগুলি মূল সমিতি "Committee of Union and Progress"এর সহিত মিলিয়া যায়। সমিতির কার্য্যাবলীর কথা ও ইহার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির কথা কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে প্রকৃত ব্যাপার তদন্ত করিবার জন্য জনৈক গুপ্তচরকে কৌশলে সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া পাঠান হয়। অচিরে সমস্ত তথ্যই প্রকাশ পাইল। সুলতান সমিতির ধ্বংস সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু রেজা পাশা সমিতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুলতানকে বুঝাইয়া দেন যে, এই সমিতি তুর্কীর ভবিষ্যৎ শক্তিস্বরূপ, ইহাকে বিনাশ করিলে রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে। সমিতির ত্রুটিকে যৌবনের খেয়াল বলিয়াই উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত। কামালকে দলচ্যুত করিয়া সাম্রাজ্যের সুদূর সীমায় কর্ম্মভার প্রদান পূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিবার জন্য পরামর্শ দেন। সুলতান এই যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিয়া কামাল ও তাঁহার সহচরগণকে সুদূর এশিয়া-মাইনরে সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়া কৌশলে নির্ব্বাসিত করেন।

অতঃপর সুলতান কামালকে আরও দূরবর্ত্তী গাজা নামক স্থানে

প্রেরণ করিলেন। পর বৎসর তিনি আবার দামাস্কে স্থানান্তরিত হন। তাহার পর কামাল আবার সিরিয়ায় প্রেরিত হইলেন। কিছুদিন পরে কামাল স্যালোনিকায় প্রত্যাগমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। স্যালোনিকার সেনাপতি তাঁহার পরিচিত ছিলেন। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে এবং ম্যাসিদোনিয়াও স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। এইসময় সুদক্ষ সেনাপতির প্রয়োজন হইলে সুলতান স্বয়ং কামালকে উক্ত কার্য্যে নিয়োগ করিয়া স্যালোনিকায় প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দেন। কামাল স্বীয় কার্য্যে যোগদান করিয়া সুদূর পল্লীতে পল্লীতে প্রচার কার্য্য চালাইবার সুযোগ পাইলেন। স্যালোনিকায় আসিয়া কামাল মাতার সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বেই স্যালোনিকায় "ইউনিয়ন ও প্রোগ্রেস কমিটি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত কমিটি কামালের আগমন সংবাদে তাঁহাকে স্বীয় দলভুক্ত করিল। ক্রমে কমিটির কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কামালের মনোমালিন্য ঘটে। আনোয়ার, জামাল, জাবের, নিয়াজ ও তালাত পাশা প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে কামাল অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাদের সহিত পাঠশালার বালকের মত ব্যবহার করিতেন। এই সময় কমিটির সভ্যসংখ্যা তিনশতেরও বেশী হইয়াছিল। কামাল ইহাদের প্রতিষ্ঠানে বাধা না দিয়া নিজের সামরিক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে আনোয়ার পূর্ব্ব ম্যাসিদোনিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যে সকল সৈন্য কমিটির বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় সকলেই

কমিটির পক্ষ অবলম্বন করিল। সৈনিক বিভাগের বহু কর্ম্মচারী অনেকদিন বেতন না পাইয়া সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তাহারা এখন সুযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহীদিগের সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। নিয়াজি ও আনোয়ার বিজয়দর্পে অগ্রসর হইলেন। জনতা তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিল। যে সকল রাজকর্ম্মচারী সুলতান আবদুল হামিদ কর্ত্তৃক দীর্ঘকাল নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, সকলেই বিদেশ হইতে আসিয়া সমিতির ভার গ্রহণ করিল। তুরস্কের সর্ব্বত্র যেন নব-জাতীয়তার বান ডাকিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে কনষ্ট্যান্টিনোপল হইতে সৈন্য আসিয়া বিদ্রোহী কর্ম্মচারীদিগের কাহাকেও বন্দী ও কাহাকেও হত্যা করিল। ইহাতে কমিটি আরও উত্তেজিত হইল। যাহাহউক, তাহারা ম্যাসিদোনিয়ার সৈন্যদিগের সাহায্য পাইল। আনোয়ার অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আবদুল হামিদ বন্দী হইলেন এবং "ইউনিয়ন এণ্ড প্রোগ্রেস" কমিটি সাম্রাজ্যের শাসন ও প্রভুত্ব গ্রহণ করিল। তুরস্কে পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। আনোয়ার এইবার সকলের সম্মুখে কমিটির প্রধান নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

নব্য তুর্কী দল ১৯০৮ সনে বন্দী সুলতান আবদুল হামিদের ভ্রাতা রেশাদ আফেন্দীকে ৫ম মোহম্মদ নাম দিয়া নামে মাত্র সিংহাসনে বসাইল। আনোয়ার সামরিক নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং জনৈক জার্ম্মাণ অফিসার সৈনিকবিভাগের পরিচালক ছিলেন। অন্যপক্ষে, কামাল সমগ্র তুরস্কের সামরিক বিভাগের ভার লইবার জন্য উৎসুক ছিলেন। তিনি

স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তুরস্কের সামরিক বিভাগ তেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। উর্দ্ধতন হইতে অধস্তন সকল কর্ম্মচারীই কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত এবং সেই সুযোগে সকলেই নিজের নিজের ইচ্ছামত তুরস্ককে লুণ্ঠন করিতে লালায়িত। কিন্তু তখন আনোয়ারের দিন—নিরুপায় কামাল সুদিনের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আনোয়ার কামালকে বিশেষরূপে চিনিতেন। তাই তিনি সর্ব্বদা তাঁহাকে দৃষ্টির বাহিরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যুদ্ধবিক্রমে তাঁহার অপরিমিত শক্তি ও কূট সামরিক নীতিতে তাঁহার অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া কামালকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হইতেন না। কামালকে দূরবর্ত্তী স্থানের সেনাপতির পদ দিয়া স্বয়ং কেন্দ্রস্থানে উপস্থিত থাকিয়া সমগ্র শাসনভার পরিচালনা করাই আনোয়ারের একমাত্র অভিপ্রায় ছিল।

তাহার পর ত্রিপলী-সমর বাঁধিয়া গেল। ১৯১১ সালে, ইতালী তুরস্কের ত্রিপলী রাজ্যটি গ্রাস করিবার জন্য অকারণ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কামাল পাশা তাঁহার সমুদয় শক্তি দিয়া ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য না পাইয়া তিনি ত্রিপলী রক্ষা করিতে পারিলেন না। ত্রিপলী ইতালীর কবলিত হইয়া গেল।

এই যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে বলকান-সমর বাধিয়া গেল। অবিলম্বে ত্রিপলী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কামাল স্বদেশ রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এই যুদ্ধে তুর্কী সেনাদের

মধ্যে উৎকোচ, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি দুর্নীতি প্রকাশ্যভাবে চলিতেছিল। বিলাসপরায়ণ সুলতান তাহা বন্ধ করিবার কোনো ব্যবস্থাই করিলেন না। ফলে, তুর্কীশক্তি দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বদেশবাসীর মধ্যে এই প্রকার দুর্নীতির প্রাবল্য দেখিয়া কামাল অধীর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু একাকী তিনি কি করিতে পারেন? আনোয়ার পাশার আন্তরিকতার অভাব ছিলনা, কিন্তু তিনি কামালকে হিংসা করিতেন। সেই জন্যই দুই বীরপুরুষের সহায়তা বিপন্ন তুরস্ক পাইলনা। বলকান-সমরে তুরস্ক পরাস্ত হইল। কিন্তু কিছুদিন পরে দ্বিতীয় বলকান সমরে কামাল পাশা অসীম সাহসে আদ্রিয়ানোপল জয় করিয়া লইলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন মহাযুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, তখন আনোয়ার পাশা সমর সচিব ও কামাল তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী মাত্র। তথাপি কামাল সৈনিকদের একান্ত প্রিয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই আনোয়ার তুরস্ককে জার্ম্মাণী পক্ষ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু দূরদর্শী কামাল বলিয়াছিলেন যে তুরস্কের পক্ষে হঠাৎ যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়া উচিত হইবে না। কামালের সাবধান বাণী গ্রাহ্য না করিয়া সুলতান জার্ম্মাণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে যোগদান করিলেন। ক্ষুব্ধ কামাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। তুর্কী সৈন্যের ভার সেনাপতি লিমান ভন্ সাভার্সের উপর ন্যস্ত ছিল। যুদ্ধ যতই চলিতে লাগিল, লিমান ততই হতাশ হইয়া পড়িলেন। কামাল পাশার উপর সৈন্যদিগের অগাধ বিশ্বাস ছিল। অবশেষে নিরুপায় মনে করিয়া

লিমান, কামালকে সৈন্য পরিচালনার জন্য আহ্বান করিলেন। কামাল সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দার্দ্দানেলিস অভিযানে একলক্ষ ষাট হাজার তুর্কীসৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সৈন্যদলে নূতন জীবন সঞ্চার হইল। দার্দ্দানেলিসের সংকীর্ণ ঘাঁটিতে মিত্র-পক্ষীয় সৈন্যগণ বিপুল বিক্রমে সমগ্র তুরস্ক গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এইখানে যদি তাহারা জয়লাভ করিত তবে তুরস্কের আশা ভরসা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইত। কিন্তু দুর্জ্জয় কামাল মিত্রপক্ষের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহাদের সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়া দিলেন। মিত্রশক্তির গতিরোধ হইল। ইংরাজসৈন্য গ্যালিপোলি ত্যাগ করিল। কামাল এই অবসরে রুষ-অধিকৃত নগরগুলি পুনরায় অধিকার করিলেন। বিজয়গৌরবে কামাল রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সমগ্র তুরস্ক জাতি তাঁহাকে অভিবাদন জানাইল, সম্মানজনক "পাশা" উপাধি প্রদান করিল।

১৯১৮ সনের প্রারম্ভে তুর্কীর যুবরাজ ওয়াহিদউদ্দীন জার্ম্মাণী পরিদর্শনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আনোয়ার সুযোগ বুঝিয়া কামালকে তাঁহার সহিত রওয়ানা করাইয়া দিলেন। সুলতান আবদুল হামিদ চিরদিন ওয়াহিদ উদ্দীনকে ভয়ের চক্ষে দেখিতেন এবং গুপ্তচর দ্বারা তাহার গতিবিধি অনুসন্ধান করিতেন। ওয়াহিদউদ্দীনের সুলতানের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আনোয়ার ও তালাত বে তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার পিতৃব্য পুত্র আবদুল মজিদকে সিংহাসনে আরূঢ় দেখিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। আনোয়ার ও তালাতের মতলব যুবরাজ বেশ বুঝিতে পারিতেন

কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইতেন না। কামাল যুবরাজকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি আনোয়ারের পরিবর্ত্তে সামরিক নেতৃত্ব প্রাপ্ত হন, তবে তুরস্ককে পুনর্জ্জীবীত করিতে পারিবেন এই আশা রাখেন। যুবরাজ কামালের কৃতিত্ব ও দক্ষতা জানিয়াও আনোয়ারকে সামরিক নেতৃত্ব হইতে বিতাড়িত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, কামালের জনপ্রিয়তা বেশী হইলেও তাঁহার অনুগামী অপেক্ষাকৃত অল্প।

১৯১৮ সনের জুলাই মাসে সুলতান ৫ম মোহম্মদের মৃত্যু হয় এবং যুবরাজ ওয়াহিদউদ্দীন ৬ষ্ঠ মোহম্মদ নামে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কামালের সহিত ইঁহার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। কামাল শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন জন্য সুলতানকে অনুরোধ করেন। সুলতান কামালের ক্ষমতার উপর আস্থাবান থাকিলেও এই বিপদের সময়ে তাঁহাকে রাষ্ট্রের কর্ণধার করিলে পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না মনে করিলেন। কামালের পশ্চাতে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল না থাকায়, সুলতান কামালকে কোনরূপ আশ্বাস প্রদান করিতে পারিলেন না।

মহাসমরে জার্ম্মাণীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের সৌভাগ্য-রবিও অস্তমিত হইতে লাগিল। হতভাগ্য সুলতান মিত্রপক্ষের বাহুবলের নিকট নির্লজ্জভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং তাঁহার সমুদয় সৈন্যসহ সেনাপতিকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। সেই সময় কামাল কার্য্যব্যপদেশে আলেপ্পোতে ছিলেন। সুলতানের কাপুরুষতার প্রতিবিধান করিবার জন্য অবিলম্বে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সুলতানকে মিত্রপক্ষের

হীনতাজনক সর্ত্ত স্বীকার করিয়া লইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সুলতান তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কামাল একবার মনে মনে ভাবিলেন, বৃথাই তিনি দার্দ্দানেলিসে জয়লাভ করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে কনষ্ট্যান্টিনোপল হইতে খবর আসিল যে, ইংরাজদের সহিত যুদ্ধবিরতি সন্ধি তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উক্ত সন্ধি মুড্রসদ্বীপে ১৯১৮ সনের ৩০শে অক্টোবর সংঘটিত হইয়াছিল। কামাল আসিয়া দেখিলেন, শত্রুগণ দিব্যি কনষ্ট্যান্টি-নোপল দখল করিয়া বসিয়া আছে। বস্‌ফরাস বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজে পূর্ণ, দার্দ্দানেলিস ইংরেজসৈনিক কর্ত্তৃক রক্ষিত, ইস্তাম্বুলে ফরাসীসৈন্য উপস্থিত। পেড়া এবং রেলপথে ইতালী সৈন্য বর্ত্তমান আনোয়ার, তালাত ও জামাল স্থানান্তরে অবস্থিত। ইউনিয়ান ও প্রোগ্রেস কমিটির অবশিষ্ট মেম্বরগণ পলায়িত সুলতান আবদুল হামিদের ভূতপূর্ব্ব সচিব তওফিক পাশা যিনি এতদিন ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তিনি এখন শত্রুপক্ষের আদেশ ধীরভাবে প্রতিপালন করিতেছেন।

কামাল সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সুলতান তাঁহাকে দোষারোপ করিলেন যে, আনোয়ার ও তালাতকে ইংরাজদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত ছিল। কামাল সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, আনোয়ার ও তালাত অপরাধী হইলেও তাহারা তুর্ক, সুতরাং তিনি বৈদেশিকের হস্তে তুরস্ককে সমর্পণ করার অপক্ষপাতী। যাহা হউক, কামাল তুরস্ককে চিরবিদায় দিতে রাজী ছিলেন না। যে কোন প্রকারে তুরস্ককে রক্ষা করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

সুলতানের কাপুরুষতার সুবিধায় বিজয়ী মিত্রপক্ষ বীরপদভরে ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করিল এবং সুলতানকে সম্পূর্ণভাবে করতলগত করিয়া ফেলিল। হতভাগ্য সুলতান মিত্রপক্ষের হস্তে পুত্তলিকাবৎ পরিচালিত হইতে লাগিলেন। নিরুপায় কামাল তখন এই অবস্থার প্রতিকার করিবার জন্য গোপনে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রেরণায় দেশের চারিদিকে যে সব গুপ্ত সভা-সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল কামাল সেগুলির মধ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে স্বাধীনতার বাণী ও আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময় তিনি সৈন্যদলের ইনসপেক্টর নিযুক্ত হইলেন। এই পদটি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইল। তিনি গোপনে গোপনে সর্ব্বত্র জাতীয় ভাব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

আতাতুর্ক কামাল

এখন আনোয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অস্তমিত। মুস্তাফা কামাল তুরস্কের এই তুর্দ্দিনে পলায়ন করা অসম্মানসূচক মনে করিলেন। সুলতান ওয়াহিদউদ্দীন একদিন কামালকে আহ্বান করিলেন। কামাল নির্ভয়ে বলিলেন যে, তাঁহাকে সামরিক মন্ত্রীত্বের পদে নিযুক্ত করিলে এবং এই বিভাগের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিলে পরে তিনি তুরস্ককে রক্ষা করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমানের শাসন-পরিষদ বাতিল করিতে হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে, ইউনিয়ন ও প্রোগ্রেস কমিটির সভ্যগণ আনোয়ারের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, মন্ত্রীদিগের অর্দ্ধাংশ রাজদ্রোহী, অবশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী কাপুরুষ; তাহাদের মধ্যে কাহারও মেরুদণ্ড নাই। সুলতান বলিলেন, "আপনি সৈন্যদিগকে অনুগত রাখিতে চেষ্টা করুন, তাহারা যেন বিদ্রোহ অবলম্বন না করে।" পরে সুলতান পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাঁহার শ্যালক ও প্রধান পরামর্শদাতা ফরিদকে প্রধান উজীরের পদে নিযুক্ত করিলেন। ওয়াহিদউদ্দীন কেবল মাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্যই ইংরেজদিগের সহিত মিত্রভাবে থাকিতে ইচ্ছুক। তিনি মনে করিলেন যে কঠোর শাসন-সংস্কার অবলম্বন করিলে কিংবা ইংরাজদিগকে কোন প্রকার বাধা প্রদান করিলে তুরস্কের ধ্বংস স্থির-নিশ্চয়। তাঁহার একমাত্র বিশ্বস্ত

প্রধান উজীর তাঁহার মতে সায় দিলেন। সুতরাং কামালের সহিত সুলতানের মতানৈক্য ঘটিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ইতালী, ফরাসী ও ইংলণ্ডে আন্তর্জ্জাতিক কলহের সৃষ্টি হইল। মহাসমরের পর সকলেই বিচলিত হইয়াছিল। ফরাসী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে লিপ্ত, তুরস্ক সম্বন্ধে কাহারও চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। বৃটিশের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ তুরস্ককে ছাড়িয়া আসিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন, তুরস্ক আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া যাইবে এবং আমরা অবশেষে উহাকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইব। এদিকে কনষ্ট্যান্টিনোপলেও মিত্রশক্তিপুঞ্জের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হইল।

তুরস্কের রাজনৈতিক গগন তখন মেঘাবৃত। আনাতোলিয়াতে গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। ইউনিয়ন ও প্রোগ্রেস কমিটির স্থানীয় সভ্যগণ বৈঠক করিতে লাগিল এবং গুপ্তসমিতি গঠিত হইল। রসদ ও যুদ্ধাস্ত্র লুট করিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। সুলতান কামালকে প্রতিনিধিস্বরূপ আনাতোলিয়াতে পাঠাইয়া গুপ্তসমিতির কার্য্যপ্রণালী রোধ করিয়া তাহাদের সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করিতে ও যুদ্ধাস্ত্র পুনঃগ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। ইংরেজগণ সুলতানের প্রস্তাবে আপত্তি করিল। তাহারা মনে করিল কামাল অতি দুর্দ্ধর্ষ এবং বিরোধী পক্ষের সহিত লিপ্ত। সুতরাং কামালকে সামরিক ভার না দিয়া ইনসপেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত করিয়া আনাতোলিয়াতে প্রেরণ করা হইল। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে, প্যারিসের কেন্দ্র-

শক্তির কনফারেন্স গ্রীকসৈন্যদিগকে স্মার্ণা অধিকার জন্য প্ররোচিত করিতেছে। এই সংবাদে কামাল ও রউফ কৃষ্ণসাগরের এক বন্দরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তুরস্কের রণতরীগুলি অকর্ম্মণ্য অবস্থায় ছিল।

গ্রীকশক্তির সম্মুখীন হইবার জন্য তুর্কীদের উপযুক্ত রসদ ছিল না। কামাল নূতন সৈন্য সংগ্রহের জন্য যুক্তি-পরামর্শ করিতে লাগিলেন। একটি গুপ্তসভার বৈঠক বসিল। কামাল বলিলেন, সুলতান ও ইস্তাম্বুল গবর্ণমেণ্ট শত্রুদিগের হস্তে অবস্থিত। আমাদিগকে আনাতোলিয়াতে সামরিক গবর্ণমেণ্ট সৃষ্টি করিতে হইবে। এই প্রস্তাবে রউফ আলী ও ফাওয়াদ সম্মতি প্রদান করিলেন, কিন্তু রাফাদ স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। যাহা হউক, স্থির হইল যে, সিভাস নামক স্থানে একটি কংগ্রেস আহ্বান করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া প্রতিরোধ কেন্দ্র প্রস্তুত করিতে হইবে। কামাল চারিদিকে জ্বালাময়ী বক্তৃতাদ্বারা লোকদিগের মনে নব প্রেরণা জাগাইয়া দিলেন। সুলতানের নামে আদেশ দিলেন যে, যুদ্ধাস্ত্র ইংরেজদিগকে প্রত্যর্পণ না করিয়া যুদ্ধের জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কামাল স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে প্রতি কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবীর দল সংগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন

এই সংবাদ কনষ্ট্যান্টিনোপলে পৌঁছিলে সুলতান ক্রোধপরবশ হইয়া কামালকে অবিলম্বে আনাতোলিয়া ছাড়িয়া আসিবার জন্য

বিশেষ আজ্ঞা দিলেন। কামাল তারযোগে সুলতানকে উত্তর দিলেন—"যে পর্য্যন্ত তুর্কীজাতি স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত আমি আনাতোলিয়াতেই অবস্থান করিব।"

দুর্ব্বল-প্রকৃতি সুলতান তখন বুঝিতে পারেন নাই, তুরস্কের শিয়রে বৈদেশিক শত্রুর লালায়িত দৃষ্টির কি ঘনকৃষ্ণ ছায়া নামিয়াছে—তাই তিনি কামালের এই উত্তরের মধ্যে শুধু দেখিতে পাইলেন, তাঁহার দাম্ভিকতা কিন্তু কামালের অন্তরে তখন জাতীয়তার যে উদ্দীপনা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাঁহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িল না। সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া কামালকে নেতৃত্ব হইতে বরখাস্ত করিলেন এবং সামরিক ও নাগরিক কর্তৃপক্ষকে ইহা তৎক্ষণাৎ জানাইয়া দিলেন। কামাল অবিলম্বে ইনস্পেক্টর জেনারেলের পদত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে মিত্রপক্ষের গ্রাস হইতে দেশোদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কনষ্ট্যান্টিনোপলে যখন এই খবর আসিয়া পৌঁছিল, তখন সুলতান কামালকে রাজদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কামাল সুলতানের আদেশকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সহিত সকল সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া তুরস্কের রাজধানীতে স্বীয় আদেশ জারী করিতে লাগিলেন। এই সময় কিছু দিনের জন্য রাজধানীতে দুই প্রকার শাসন ব্যবস্থা চলিতে লাগিল।

তারপর ইস্তাম্বুল গবর্ণমেণ্ট হইতে কাজেমকারী বাঘার নিকট কামালকে বন্দী করিয়া, কনফারেন্স ডেলিগেটদের স্ব স্ব গৃহে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ আসিল। ইহাতে কনফারেন্সের প্রতিনিধি-বৃন্দ গবর্ণমেণ্টের উপর রোষপরবশ হইয়া বিদেশীয় শত্রুদিগের

উপর প্রতিশোধ লইতে এবং সাময়িক গবর্ণমেণ্ট (Provisional Government) স্থাপন করিতে স্থির সিদ্ধান্ত করিল। তুরস্কের বিভিন্ন দেশ হইতে সিভাস কংগ্রেসে প্রতিনিধি আসিয়া পৌঁছিল। কামাল বক্তৃতা দ্বারা ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে মন্ত্রীদিগের ক্রোধ জাগাইয়া তুলিলেন। মন্ত্রীগণ কংগ্রেসকে জনসাধারণের মুখপাত্র বলিয়া দাবী করিলেন। তাঁহারা বৈদেশিক শক্তিকে প্রতিরোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া জাতীয় চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, যে পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষ উক্ত চুক্তিপত্রের সর্ত্ত না মানিবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহাদিগের সহিত কোনরূপ সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইবেন না। অতঃপর ইস্তাম্বুলের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে স্বতন্ত্র আর একটি সাময়িক গবর্ণমেণ্ট পরিচালন জন্য একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নির্ব্বাচিত হইল। কামাল উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। তাহার পর উক্ত কংগ্রেস কনষ্ট্যান্টিনোপলে নূতন পার্লামেণ্ট গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু কনষ্ট্যান্টিনোপল হইতে কোন প্রত্যুত্তর না আসায় কামাল স্বয়ং কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন, এবং কনষ্ট্যান্টিনোপলের সহিত সংবাদপত্রের আদান প্রদানের পথ বন্ধ এবং টেলিগ্রাফ লাইন কাটিয়া দিবার আদেশ দিলেন। কনষ্ট্যান্টিনোপলে যে পার্লামেণ্ট গঠিত হইল তাহাতে কংগ্রেস পক্ষই প্রবল হইল। তুরস্কের স্বাধীন গণতন্ত্রের ভিত্তি এইরূপে স্থাপিত হয়।

মন্ত্রীগণ সানন্দে কনষ্ট্যান্টিনোপলে সমবেত হইলেন। সুলতান কিম্বা ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত কোন আদেশ পালন না

করিবার যুক্তিই আঁটা হইল। ইহাতে ইংরাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদেরই হুকুম পালনের জন্য কঠোর আদেশ দিল। সকলেই উহা উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিল। মন্ত্রীগণ জাতীয় চুক্তি-পত্রের আদেশগুলি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন। ইহার ফলে ১৬ই মার্চ্চ ইংরাজগণ কনষ্ট্যান্টিনোপল অধিকার করিয়া বসিল এবং রউফ, ফেদী প্রভৃতি মন্ত্রীগণকে বন্দী করিয়া মণ্টা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিল। সেই সঙ্গে পার্লামেণ্টের দ্বার রুদ্ধ করা হইল। সুলতান বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। যে সকল লোক জাতীয় দলের স্বপক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদের সকলকে স্ব স্ব পদ হইতে বহিষ্কৃত করা হইল।

এদিকে আঙ্গোরায় নূতন পার্লামেণ্ট বৈঠকের আদেশ প্রদান করিলেন। যে সকল মন্ত্রী তখন নির্ব্বাচিত হইলেন, তাঁহা-দিগকে লইয়া জাতীয় মহাসমিতি (Grand National Assembly) গঠিত হইল। প্রত্যেক তুর্কী উক্ত সমিতিতে যোগদান করা কর্ত্তব্য মনে করিল। যে জাতি সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছে, তাহারা পরাধীনতা স্বীকার করিতে স্বভাবতঃই নারাজ। তাহারা এখন পূর্ব্বাপর বিদ্বেষ কলহ ভুলিয়া গিয়া কামালের পার্শ্বে একতাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সকলে কামালকে একবাক্যে জাতীয় নেতা বলিয়া ঘোষণা করিল এবং সুলতানের মন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে এবং গ্রীস ও তাহার সাহায্যকারী শক্তিপুঞ্জকে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

প্রেসিডেণ্ট উইলসন, লয়েড জর্জ্জ ও ফরাসী সচিব প্যারিসে বৈঠক করিলেন। তাঁহারা কামালের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী ভেনিজিলাস গ্রীক-বাহিনী প্রস্তুত করিয়া ইংরাজ ও ফরাসীদিগের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিলেন এবং তুর্কীদিগকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিবার জন্য যুক্তশক্তির নায়কত্বে স্মার্ণায় গ্রীকসৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। মিত্রশক্তি ইহাতে সম্মতি দিল, কারণ তাঁহারা মনে করিলেন এই সুযোগে কামালের শেষ শক্তিকে বিনষ্ট করা সহজ হইবে।

১৯২১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীকগণ অগ্রসর হইল। তুর্কীসেনা প্রথম আক্রমণে হটিয়া গিয়াছিল, কামাল তাহাদিগকে নবোৎসাহে উৎসাহিত করিয়া তুরস্কের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে উত্তেজিত করিলেন। ইউনু নামক স্থানে যুদ্ধ হইল। এদিকে গ্রীসে রাজনৈতিক বিপ্লব আরম্ভ হইল এবং ভেনিজিলাস তাঁহার বন্ধুবর্গসহ এথেন্স হইতে বিতাড়িত হইলেন। ইংলণ্ড, ফরাসী, ইতালী, গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ অবসান করিতে ইচ্ছা করিল; গ্রীক ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করায় শক্তিপুঞ্জ নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল। সুতরাং গ্রীক ও তুরস্ক মধ্যেই কলহ সীমাবদ্ধ হইল। ফরাসী গোপনে আঙ্গোরাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। ইতালী যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয় করিতে লাগিল। আফগানিস্থান ও পারস্য মিলন-সূত্র স্থাপনের জন্য প্রতিনিধি পাঠাইল। আর মিশরে তুরস্কের সাহায্যের জন্য আন্দোলন চলিতে লাগিল।

গ্রীকসৈন্য তিনদিক হইতে ইসকি সহরকে পরিবেষ্টন করিল।

ইসমেৎ পাশা বিপুল বিক্রমে গ্রীকবাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। তুর্কীসৈন্য গ্রীকদিগকে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া ইসকি সহর পরিত্যাগ করিয়া সাকারিয়া নদীপার্শ্বে শিবির স্থাপনের আয়োজন করিল। একুশদিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে কামালের দুর্ব্বার আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ১৯২২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীকগণ সাকারিয়া নদী পুনরতিক্রম করিতে বাধ্য হইল। নদীর অপর পারে বিজয়ী তুর্কীসৈন্য নব্যতুর্কীর বিজয়পতাকা উড়াইল। এইরূপে এশিয়ামাইনর অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কামাল ইস্তাম্বুলের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামালের অপ্রত্যাশিত বিজয় দেখিয়া মিত্রশক্তি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

আঙ্গোরা জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইল, কামাল "গাজী" উপাধিতে ভূষিত হইলেন। বৈদেশিক রাজ্য হইতে প্রশংসাবাদ আসিতে লাগিল। রাশিয়া, আফগানিস্থান, আমেরিকা এমন কি ফরাসী ও ইতালী তুরস্কের এই গৌরবে আনন্দ প্রকাশ করিল।

এইবার ইসমেৎ, ফৌজী ও কামাল একযোগে শাসনসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসীর সহিত গুপ্তসন্ধি স্থাপন করিয়া সিরিয়ার সীমান্ত হইতে আশী হাজার মোসলেম কয়েদীর মুক্তি গ্রহণ করিলেন। কামাল মস্কো হইতে অর্থ কর্জ্জ করিয়া ইতালী ও আমেরিকার নিকট হইতে যুদ্ধাস্ত্র খরিদ করিলেন এবং প্রত্যেক সহর ও গ্রাম হইতে সৈন্য সংগ্রহে ব্রতী হইলেন।

পুনরায় গ্রীকসৈন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত

হইল। যদিও তাহারা সমুদ্রের অপর পারস্থ স্মার্ণা হইতে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহারা কনষ্ট্যান্টিনোপলের পশ্চিম পার্শ্বে থ্রেস আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কেহ কেহ কামালকে উহাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পরামর্শ দিল। কিন্তু তিনি গ্রীকবাহিনীর নেতা জেনারেল হেরিংট্যানের প্রতি সন্দিহান হইয়া সন্ধি করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। উভয় পক্ষ অগ্রসর হইতে লাগিল। হঠাৎ যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য গ্রীকপক্ষ হইতে আদেশ আসিল। ফরাসী, মহাসমরের পর, রুষ-মিত্র তুরস্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া আর একটি মহাসমরের আয়োজন করিতে ভয় পাইল। ফরাসীর প্রতিনিধি মুস্তাফা কামালের নিকট আসিয়া শক্তিপুঞ্জের পক্ষে যে কোন সর্ত্ত গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কামাল ইহাতে রাজী হইলেন। যুক্ত-শক্তি গ্রীকদিগকে থ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিবে এবং কনষ্ট্যান্টিনোপল পরিত্যাগ করিবে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। সুযোগ বুঝিয়া কামাল জাতীয় চুক্তিপত্র উপস্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তুরস্ক স্বীয় সাম্রাজ্য মধ্যে স্বাধীন সাম্রাজ্য হিসাবে অবস্থিতি করিবে এবং কোন বৈদেশিক শক্তি ঐ স্বাধীনতার উপর কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, এই চুক্তিপত্র চূড়ান্তভাবেই স্বীকৃত হইল। দিকে দিকে নব্যতুরস্কের স্বাধীনতার বার্ত্তা ঘোষিত হইল।

সোভিয়েট, পারস্য, আফগানিস্থান, সিরিয়া ও মিসর হইতে প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জন্য আশ্বাস আসিতে লাগিল। কিন্তু বীর-কেশরী কামাল নিজ লক্ষ্যের বাহিরে এক

পদও অগ্রসর হইলেন না। তিনি প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে অযথা সংগ্রাম করিতে বা জিঘাংসাপরায়ণ হইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সম্মুখীন হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলিলেন, "আমাদের একমাত্র শাসন-নীতি তুরস্কের স্বার্থ রক্ষা করা। আমরা তুরস্ককে একটি স্বাধীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যে পরিণত করিব।"

কনষ্ট্যান্টিনোপলে সুলতান খলিফার হস্তে শাসন ও ধর্ম্মভার ন্যস্ত ছিল। তিনি প্রধান উজির ও মন্ত্রীবর্গ দ্বারা নামে মাত্র শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন, এদিকে আঙ্গোরায় সামরিক শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এইবার বৈদেশিক শক্তির নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া কামাল সুলতান খলিফার ক্ষমতাকে চির-বিদায় দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ইতিমধ্যে "বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘ" (League of Nations) সুইজারল্যাণ্ডের লুসান নামক নগরে এক বৈঠকে সুলতানকে সন্ধিসর্ত্ত আলোচনা করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইতে আহ্বান করিলেন এবং আঙ্গোরায় জাতীয় মহাসমিতি আহ্বান করিতে সুলতানকে অনুরোধ করিলেন।

সুলতানের নাম শুনিতেই আঙ্গোরার নেতৃবৃন্দ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। তাঁহার বিরুদ্ধে চারিদিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, অপদার্থ সুলতান ইংরেজ ও গ্রীকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তুরস্কের জাতীয়তাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আঙ্গোরার জাতীয় মহাসমিতি প্রধান উজীরকে দোষারোপ করিতে লাগিল যে, ইংরাজের পক্ষ হইয়া আঙ্গোরার মহাসমিতির আহ্বানপত্রে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার কোন অধিকার

ছিল না। প্রকৃত শাসনভার আঙ্গোরার হস্তেই ন্যস্ত। ইস্তাম্বুল গভর্ণমেণ্ট অস্তিত্ব-বিহীন। অতঃপর সুলতান ও খলিফার পদ বিভিন্ন করিবার প্রস্তাব চলিল। জাতীয় মহাসমিতি একবাক্যে সুলতানপদের উচ্ছেদ ঘোষণা করিল এবং সুলতানের উচ্ছেদ সাধন সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত করিবার জন্য তিনটি কমিটি বসিল। কামাল সেদিন এই তিনটী কমিটিকে সম্বোধন করিয়া আবেগময়ী ভাষায় বলিয়াছিলেন—"The Grand Assembly must possess the national sovereignity. Sovereignity is something which is not academic. It is acquired by force, by power, by violence. The nation has, in fact, revolted against these usurpers. It is an actual fact. In reality you have nothing to discuss. It has come to a question of merely giving expression to what has long been an accomplished fact." "জাতীয় কর্ত্তৃত্ব এই জাতীয় মহাসমিতির উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হইবে। এই কর্ত্তৃত্ব শুধু কথার কথা নহে, ইহা স্বতন্ত্র জিনিষ; ক্ষমতা, শক্তি ও দুর্জ্জয় সাহস দ্বারা ইহা অর্জ্জন করিতে হয়। আমরা তাহাদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি যাহারা আমাদিগকে ইহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। আমাদের এই কর্ত্তৃত্বলাভ আজ বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনার আবশ্যকই নাই। যাহা আমরা বাহুবলে অর্জ্জন করিয়াছি আজ তাহাকেই মাত্র আমরা ভাষায় প্রকাশ করিব"।

ইসমেৎ ইনোন্থ (তুরস্কের বর্ত্তমান সভাপতি)

কামালের এই বক্তৃতায় কমিটির সদস্যগণ বিচলিত ও মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা একবাক্যে সুলতানের সিংহাসনচ্যুতি কামনা করিলেন। সুলতানত্বের উপরে তাঁহারা জাতীয়তাকে স্থান দিলেন। ১৯২২ সালের ১১ই নভেম্বর রাত্রির অন্ধকারে হতভাগ্য সুলতান সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ইউরোপ যাত্রা করিলেন। ওটোম্যান বংশের উপর চিরদিনের মতন যবনিকা পড়িল।

সুলতান আবদুল মজিদ আফেন্দী খলিফার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু রাজশক্তি পরিচালনার কোন ক্ষমতাই তাঁহাকে দেওয়া হইল না। লুসান কনফারেন্সে নব্যতুর্কীর পক্ষ হইতে ইসমেৎ পাশা প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরিত হইলেন। (আতাতুর্কের পরলোকগমনের পর বর্ত্তমানে ইনিই তুরস্কের সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।) বহু তর্কবিতর্ক এবং আলোচনার পর তুরস্কের সমস্ত দাবী সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত হইল। শক্তিপুঞ্জ নিঃশব্দে কনষ্ট্যান্টিনোপল পরিত্যাগ করিল। তাহারপর মন্ত্রীসভা ইস্তফা প্রদান করিলে, জাতীয় মহাসমিতি নূতন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিল। তুরস্কের শূন্য সিংহাসনের উপর গণতন্ত্রের সুবর্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইল। জনসাধারণ একবাক্যে কামালকে এই গণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিল। জাতীয় মহাসমিতি কামালকে স্বীয় ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীসভা গঠন করিবার অধিকার দিল। কামাল এখন একদিকে সাধারণতন্ত্রের সভাপতি এবং অন্যদিকে মন্ত্রীসভা ও জনসাধারণের একমাত্র নেতা ও সর্ব্বোপরি সৈনিক বিভাগের সর্ব্বপ্রধান নায়ক হইলেন।

পরবর্ত্তী বৎসর ১৯২৪ সনে ৩রা মার্চ্চ জাতীয় মহাসমিতি কয়েকটি বিশেষ বিল পাশ করেন। তাহার মধ্যে প্রধান বিল ছিল খেলাফতের উচ্ছেদ সাধন। কামাল একদিন স্পষ্টই খলিফাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, একমাত্র ঐতিহাসিক স্মৃতি ভিন্ন বর্ত্তমান খেলাফতের আর কোন মূল্যই নাই, ইহা যেন তিনি স্মরণ রাখেন।

তারপর সমগ্র সাম্রাজ্যকে খেলাফতের কবল হইতে মুক্ত করিয়া খলিফাকে নির্ব্বাসিত করাই কামালের লক্ষ্য হইল। একবাক্যে উক্ত বিল জাতীয় মহাসমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। খলিফা আবদুল মজিদ পরিবার পরিজন সহ ইস্তাম্বুল পরিত্যাগ করিলেন। ওসমানিয়া খেলাফতের অবসান হইল।

এইরূপে কামালের কৈশোরের সঙ্কল্প পূর্ণ হইল। দেশের কাজে আত্মদান করিয়া তাঁহাকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে; নির্ব্বাসনের লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হইয়াছে। আপোষে সম্মত হইয়া তিনি কোনদিন স্বীয় মহানীতির অবমাননা করেন নাই। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তুরস্কের একখানি মানচিত্র লইয়া যখন তিনি গভীর ধ্যানে দেশের চিন্তায় ডুবিয়া যাইতেন, কে জানিত, তখন এইরূপেই তিনি তুরস্কের আকৃতি-প্রকৃতির সহিত নিবিড় নিখুঁতভাবে স্বীয় প্রকৃতির পরিচয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে ভবিষ্যতের জন্যই প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

জন্মভূমির ধ্যানমূর্ত্তি তাঁহার অন্তরে স্থায়ী রূপ লইয়াছিল। দেশের চরম দুর্দ্দিনে তাই অসংখ্য বিপদ ও বাধা-সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনিই সভাপতির সম্মানীয় পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। সমগ্র জাতির কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল :—

"পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল আসে ওই,
কামাল, তুমনে কামাল কিয়া ভাই।"

আধুনিক তুরস্ক

"আমরা আজ মানুষের ইতিহাসে যুগান্তরের সময় জন্মেছি। ইউরোপের রঙ্গভূমিতে হয় ত বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পটপরিবর্ত্তন হচ্ছে। এশিয়ার নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত হ'তে আর এক দিগন্তে ক্রমশঃই ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়্‌লো। মানব-লোকের উদয়গিরি শিখরে এই নব প্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিষ বটে। এই মুক্তির দৃশ্য; মুক্তি কেবল বাইরের বন্ধন থেকে নয়, মুক্তির বন্ধন থেকে, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বন্ধন থেকে," রবীন্দ্রনাথ।

মুস্তাফা কামাল আঙ্গোরায় নব প্রজাতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। গণশক্তির প্রতিভূরূপেই তিনি রাজ্য-শাসন, সেনাদল, পররাষ্ট্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই পরিচালনার ভার জাতীয় মহাসভার হস্তে ন্যস্ত করিয়া, তুরস্কের মাথা হইতে তিনি খেলাফতের গুরুভার নামাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মের বিরাট প্রতিষ্ঠান রসহীন তরুর ন্যায় যেখানে নিঃসার রসশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ব্যর্থ গরিমা শুধু বাহিরের আড়ম্বর সৃষ্টি করিয়া মানুষকে মুগ্ধ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে—জাতীয় অভ্যুত্থানের এত বড় বিরুদ্ধ-শক্তি আর নাই। কামাল এশিয়ার ধর্ম্ম-বীর্য্যকে এই বিড়ম্বনার দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। জাতির মুক্ত আত্মা, নূতন শিক্ষায় সাধনায় সত্যই যদি এমন কিছু সত্য পাইয়া থাকে যাহা জাতীয়

নব্য তুরস্কের অন্যতম সহর—ইস্তাম্বুল
(এই সহরে কামাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন)

জীবনের পক্ষে অমৃত, সেই অমৃতের আস্বাদেই ধর্ম্মের সনাতন রূপটি আবার জাতীয় হৃদয়ে ফুটাইয়া তুলিবে। সেই রূপ হইবে বিশুদ্ধ, সরল ও আড়ম্বরবর্জ্জিত। প্রাচ্যের সেই অমৃতই আবার জগতকে নবজীবন দিতে পারিবে। আর তুরস্ক যদি আপাততঃ মুক্তির সম্মোহনে বিমুগ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়ে, ইউরোপের দানের সঙ্গে ইউরোপের প্রাণকেও নিজের ভিতর আহ্বান করিতে চায় সে পরধর্ম্মের বোঝা খেলাফতের বোঝার চেয়েও দুঃসহ হইয়া মরণেরই কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুখের বিষয়, কামালের গত পঞ্চদশ বৎসরের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার সাধনা এই আধ্যাত্মিক অপমৃত্যু হইতে তুরস্কজাতিকে রক্ষা করিয়াছে এবং তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা ও আদর জাতীয় জীবনে যথার্থ-ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

যে সমস্ত কল্যাণকর সংস্কার কামালের অধিনায়কত্বে আজ তুরস্কে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হইল নারী আন্দোলন। কামালের বিধানে তুরস্কের নারী আজ অবরোধমুক্তা। তাহারা শিক্ষায়, কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই পুরুষের সহিত সমান সুযোগ ও দায়িত্ব লাভ করিয়াছে। তুরস্কের বিদ্যালয়ে আজ অবাধে মহিলা ছাত্রীগণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষায়, স্থাপত্য বিদ্যায়, আইন ব্যবসায়, চিকিৎসা শাস্ত্রে, সর্ব্বক্ষেত্রেই নারী প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার পাইয়াছে। নব্য-তুরস্কের সমাজ-জীবনে ইহাতে কতখানি স্বাস্থ্যের সঞ্চয় হইয়াছে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

তুরস্কের নারী-স্বাধীনতা কামালকে আইনতঃ সিদ্ধ করিতে হইয়াছে। পর্দ্দার আড়ালে ও বোরখার অন্তরালে পাপের সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় স্বাভাবিক, তাহা ভুক্তভোগী জাতির অবিদিত নাই। কামাল তাই আইন করিয়াছেন যে, নারী যদি আবরণ রক্ষা করে, তবে তাহার প্রথমে অর্থদণ্ড হইবে, দ্বিতীয়বার অপরাধ করিলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, তৃতীয়বার রাজবিধি অমান্য করিলে প্রাণদণ্ড হইবে। জাতির উন্নতির অন্তরায় বলিয়া যাহা অনুভব করিয়াছেন গাজী মুস্তাফা কামাল তাহা কঠোর বিধি প্রনয়ণ দ্বারা উন্মূলিত করিয়া গিয়াছেন—গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এই নির্ভীক অভিযান কতখানি আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে তাহা সহজেই অনুমেয়।

কামালের এই নবশাসন-সংস্কারে যিনি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন তিনি একজন নারী। এই মহিয়সী তুর্কী রমণীর নাম মাদাম হালিদা এদিব হানুম। তিনি আজ সর্ব্বজন পরিচিতা। ইস্তাম্বুলের আমেরিকার নারীশিক্ষালয় হইতে ইনি সর্ব্বপ্রথম ডিগ্রী লইয়া বাহির হন। তিনি একাধারে বিদুষী লেখিকা, শিক্ষয়িত্রী ও জাতীয় দলের অন্যতম নেতৃস্বরূপিনী। তিনি বিদ্যালয়ে, রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাগারে, সেনাশিবিরে, আবার সেবিকাবেশে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সমান ভাবেই সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া তুরস্কের নারীজীবনে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন। সমাজে যুগান্তর আনিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হালিদা তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে নব্য তুরস্কের অভ্যুদয়ের

সমস্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাদাম একবার ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন।

শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী হইয়া কামাল এত অল্প সময়ের মধ্যে যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা একপ্রকার অসাধ্য সাধন বলিলেই হয়। তুরস্কে প্রচলিত আরবী বর্ণমালার পরিবর্ত্তে তিনি ল্যাটিন বর্ণমালার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, বৈদেশিক জাতির সহিত ভাষার আদান প্রদানের সুবিধা ও জাতীয় ভাব প্রচারের ইহাতে বর্ত্তমানে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলিলেই হয়। যাহাতে প্রত্যেক পল্লীর রাখাল, কারখানার মজুর, দোকানদার, ব্যবহারজীবি প্রত্যেকে নূতন বর্ণমালা শিক্ষা করে তাহার জন্য কঠোর আইন পাশ করা হইয়াছে। কামাল স্বয়ং কালো বোর্ড ও খড়িমাটি সহ স্থানে স্থানে গিয়া জনসাধারণকে শিক্ষা দিতেন। কোন সরকারী কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষর মালা না শিক্ষা করিলে কার্য্য হইতে অপসৃত হন এবং আপত্তি বা ঔদাস্য প্রকাশ করিলে রীতিমত দণ্ডিত হন।

বর্ত্তমান তুরস্কে নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে :—

১। কিণ্ডারগার্টেন।

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়।

৩। সেকেণ্ডারী স্কুল।

৪। সঙ্গীত, চারুশিল্প, শরীর চর্চ্চা প্রভৃতির স্কুল।

৫। বিভিন্ন ব্যবসা-সংক্রান্ত শিক্ষায়তন।

৬। উচ্চ বিদ্যালয় (বিশ্ববিদ্যালয়)।

সমগ্র তুরস্কে এখন বিদ্যায়তনের সংখ্যা অন্যূন ৮৭০০, এ ছাড়া প্রায় শতাধিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আইনের বলে "ফেজকে" তুরস্ক হইতে কামাল নির্ব্বাসিত করিয়া গিয়াছেন। পুলিশ কর্তৃক সকল অধিবাসীর "ফেজ" সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। যাহারা আপত্তি করিল তাহারা বন্দী হইল। তুরস্কের প্রত্যেকে ফেজের পরিবর্ত্তে এখন হ্যাট ব্যবহার করিতেছে।

তাহার পর কামাল ধর্ম্মকে রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিলেন। ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিলেন। শ্রমজীবির উপর ধর্ম্মের অসহনীয় চাপ উন্নতির অন্তরায় বোধে স্বতন্ত্র যাজক শ্রেণীর উচ্ছেদ সাধন করিলেন এবং তাহাদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য আইন পাশ করিলেন। প্রত্যেক মোল্লাকে শ্রমলব্ধ উপায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য করা হইল।

ইউরোপ হইতে বিশেষ বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি আনাইয়া শাসন-বিভাগগুলির পুনর্গঠন করা কামালের অন্যতম কীর্ত্তি। বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে জার্ম্মাণী, দেওয়ানী শাসনবিধি সম্পর্কে সুইটজারল্যাণ্ড ও ফৌজদারী শাসন বিধি সম্বন্ধে ইতালীর আদর্শ গৃহীত ও অনুসৃত হইল। বহুবিবাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হইল।

মোট কথা, দেশের ও জাতির কল্যাণে কামাল যখন যাহা ভাল বিবেচনা করিয়াছেন তাহাই সমস্ত প্রতিবন্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজধানী আঙ্গোরাকে সর্ব্বপ্রকারে আধুনিক করিয়া তুলিবার জন্য কামাল বার্লিন ও ভিয়েনা হইতে বহুদর্শী ও কৃতী ব্যক্তি আনাইয়া নূতন নক্সা অনুযায়ী শহরের রাজপথ ও ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের একাধিক পর্য্যটক নব্যতুর্কীর রাজধানীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তুরস্কের এই সাফল্যজীবন অধিনায়কের সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের জনৈক বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ লিখিয়াছেন :—

Politically, Turkey has been transformed from a multi-national empire into a uni-national republic......Can any man in any country really hope to carry through, in a single life time, so radical and so comprehensive a revolution as all this ?......if any man can do it, that man is Mustafa Kemal. অর্থাৎ :—"রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া বহুজাতি সম্মিলিত সাম্রাজ্য হইতে তুরস্ক একজাতিবিশিষ্ট সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিপ্লব কোনো মানুষ একা এক জীবনে সম্পন্ন করিতে পারে কি ? যদি কেহ ইহা পারে, তবে সে ব্যক্তি এই মুস্তাফা কামাল।"

কামালের জীবন স্পষ্টই বুঝাইয়া দেয়—মাটীর সঙ্গে দরদ মিশাইয়া জাতীয় ঐক্য ও উন্নতির বিধানে ষোল আনা আত্মদান

করিলেই জাতীয়তার মন্ত্র সিদ্ধ হয়। প্রাচ্যের এই বিজয়ী অধিনায়ককে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। তাঁহার কীর্ত্তির অপেক্ষাও তিনি মহৎ; জীবিতকালে এই মহত্ত্ব যেরূপ উজ্জ্বল ছিল, কামালের মৃত্যুর পরও সেই মহত্ত্ব দেশ কাল ও পাত্রের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া চিরদিন অম্লান থাকিবে—ইহাই আমার বিশ্বাস। কামালের জীবনালোকে যদি আমার এই শতধা বিভক্ত ও অধঃপতিত দেশ ও জাতির একটি প্রাণীও দেশপ্রেমে সর্ব্বস্বত্যাগের পথ দেখিতে পায় তবেই আমার এই জীবনালোচনা সার্থক হইবে।
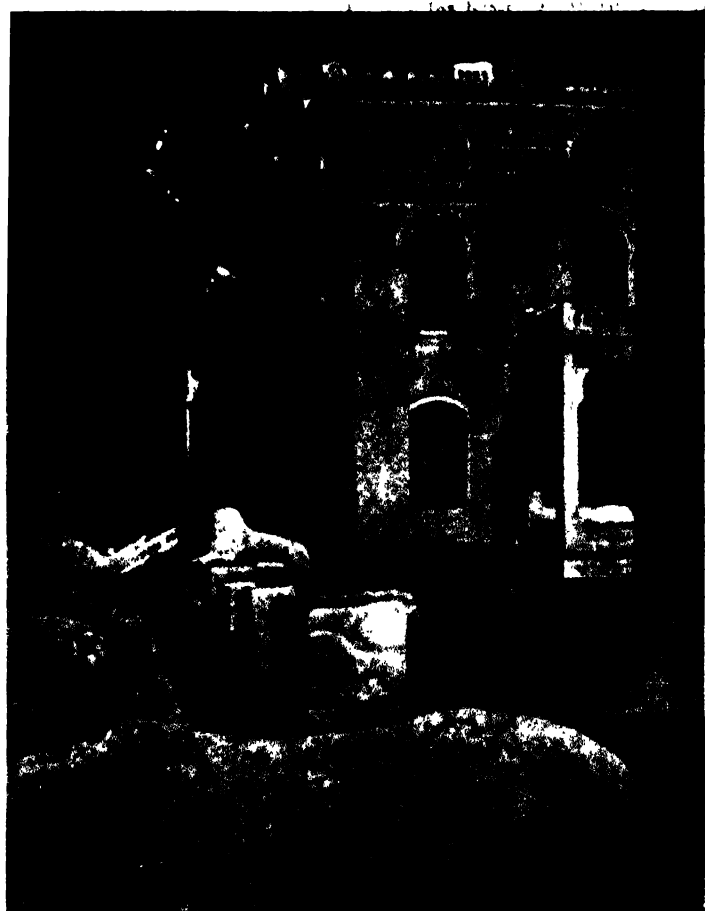
নব্য তুরস্কের পার্লামেন্ট ভবনের একাংশ

পরিশিষ্ট (১)

কামালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

আনকারা, ২১শে নভেম্বর

অদ্য প্রাতঃকালে বিপুল আড়ম্বরে কামাল আতাতুর্কের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শবাধারবাহী শকটসহ মিছিল পার্লামেণ্ট ভবন হইতে জাতিবিজ্ঞান বিষয়ক সংগ্রহশালা (এথনোলজিক্যাল মিউজিয়াম) অভিমুখে যাত্রা করিলে বারিবর্ষণ আরম্ভ হয়। বিশেষভাবে পরিকল্পিত একটি স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত কামাল আতাতুর্কের দেহ উক্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইবে। সহস্র সহস্র শোকবিহ্বল নর-নারী রাজপথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা 'আতাতুর্ক, আতাতুর্ক, কোথায় তুমি!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল। কামালের ভগিনী অশ্রুসিক্ত নয়নে শবাধারবাহী শকটের অনুগমন করিতেছিলেন। শোকসূচক তোপধ্বনি এবং বিমান বহরের ঘর্ঘর নিনাদে শোকযাত্রার অগ্রগতি সূচিত হইতেছিল।

ইংলণ্ডেশ্বরের পক্ষ হইতে ফিল্ড-মার্শাল লর্ড বার্ডউড এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের মধ্যে অন্যান্যের সহিত স্যার ডাডলে পাউণ্ড দুইশত নৌ-সৈন্য ও ব্যাণ্ডসহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিনিধিগণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট (২)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :—

"এক সময়ে এশিয়া আপনার প্রাচীন সভ্যতার গর্ব্ব করিত এবং বর্ত্তমানের অবমাননা বিস্মৃত হইবার জন্য গৌরবময় অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিত। তৎপর আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই অন্ধকার ও নৈরাশ্যের যুগ আসিল। এই সময়ে এশিয়া ইউরোপের হীন অনুকরণ করিয়া আপনার উপর হীনতার ছাপ মারিয়া দিল। কিন্তু অলৌকিক ঘটনার ন্যায় হঠাৎ নবযুগের আবির্ভাব হইল এবং এশিয়া আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিল। সুদূর প্রাচ্যে জাপান নূতন যুগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নিজ সম্পদ নিয়োজিত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে আপনার আসন ও মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু ভাবিতে দুঃখ হয় যে, ঔদ্ধত্য জাপানের ধ্বংশের পথ সুগম করিতেছে এবং আমরা আর তাহাকে এশিয়ার মর্য্যাদার পুনরুদ্ধার-কারীরূপে দেখিতে পারি না। যে সময় নবজাগরিত তুরস্কের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তখন কামালের মৃত্যু সংবাদ আসিল। এক সময়ে তুরস্ককে 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' আখ্যায় অভিহিত করা হইত : অবশেষে কামাল আসিয়া আমাদের সম্মুখে নূতন এশিয়ার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই দৃষ্টান্ত আমা-

দিগকে প্রাচ্যে এক নবজীবনের আশা দিয়াছে। এই দিক হইতে কামালের তেজস্বীতা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রশংসা লাভের যোগ্য। তাঁহার মৃত্যুতে তুরস্কের যেরূপ গুরুতর ক্ষতি হইল সমগ্র এশিয়ারও সেইরূপ ক্ষতি হইল। কামাল পাশার বীরত্ব কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি মানুষের সর্ব্বপ্রধান শত্রু অন্ধ কুসংস্কারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি মুক্তিদাতা ছিলেন; আমাদের নিকট তিনি এক উচ্চ আদর্শস্বরূপ থাকিবেন কারণ কুসংস্কার অপেক্ষা অনুৎকৃষ্টতর ধর্ম্মানুরাগরূপ চোরাবালির উপর দাঁড়াইয়া আমরা জাতীয় বিচ্ছিন্নতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমার হিন্দুস্বদেশবাসীদের নিকট আমার দৃঢ় বিশ্বাসপূর্ণ বক্তব্য এই যে, 'তোমাদের সমাজ অর্থহীন আচার ও অনুষ্ঠানের ভারে কাতর; তোমরা যদি কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া নূতন যুগের আহ্বানে সাড়া না দাও, তাহা হইলে তোমার ধ্বংস হইবে।'

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু :—

যদিও ভারতীয় মুসলমানগণ কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক প্রবর্ত্তিত বহু সংস্কার সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না, তথাপি তাঁহারা এই শিক্ষা লাভ করিতে পারেন যে, কামাল তুরস্কের মুসলমানদিগকে শিখাইয়াছেন যে, স্বদেশের জন্য সংগ্রামে দাসত্ব ব্যতীত আর কিছু হারাইবে না এবং নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি ব্যতীত আর কোন লাভ হইবে না। তাঁহার জীবন দীর্ঘ না হইতে পারে কিন্তু উহা সফল কার্য্যে সমৃদ্ধ।

তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাঁহার স্বদেশে নহে; সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ভারতীয়দের চক্ষে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কামাল আতাতুর্ক প্রবর্ত্তিত সংস্কারসমূহের উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতজী বলেন যে, ইউরোপীয় টুপীর প্রচলন ভারতে গান্ধী টুপীর ন্যায় মানসিক বিপ্লবের প্রতীক; আর আরবী বর্ণমালা বর্জ্জনের উদ্দেশ্য তুরস্ককে বিদেশী বর্ণমালা দ্বারা আরোপিত কৃত্রিমতামুক্ত হইয়া নিজের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ করা।

পণ্ডিতজী কামালের কার্য্যকলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে খিলাফত রহিত করণ, তুরস্ক কর্ত্তৃক জার্ম্মাণীকে সাহায্য করা এবং তৎফলে কামালের বৃটিশের বিরাগভাজন হওয়া; তৎপর বৃটিশ চক্রান্তে আরবদের বিরোধিতা ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত সংস্কারে ভারতের বিরোধীতার উল্লেখ করেন। পণ্ডিতজী আরও বলেন যে, গত মহাযুদ্ধের সময়ে, ইংরাজগণ সমগ্র আরবকে, একত্র করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া উহার অধিবাসীদিগকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি এক্ষণে ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়ে পরিণত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট (ঙ)

কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুতে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের শোকপ্রকাশ

নব্যতুরস্কের রাষ্ট্রনায়ক কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবী শোকপ্রকাশ করিয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকা হইতে সুরু করিয়া সকল দেশের ও সকল জাতির লোক এই বীর-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করিয়াছে। ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রের অভিমতের সারাংশ আমরা নিম্নে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম :—

আনন্দবাজার পত্রিকা

নব্যতুর্কীর স্রষ্টা, পালয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা কামাল আতাতুর্ক চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। প্রাচ্যের লক্ষ কোটি নিপীড়িত পরাধীন নরনারী আজ তুর্কী জাতির এই মহান শোকে আর্ত্ত, ব্যাকুল ও ভয়চকিত হইয়া উঠিবে। জ্যোতির্ম্মান সূর্য্যের মত কামাল তুর্কীজাতির ভাগ্যগগনে উদিত হইয়াছিলেন; তাঁহার রশ্মিসম্পাতে তুর্কীজাতির নৈরাশ্য, কুসংস্কার, দুর্নীতির ব্যর্থতার বেদনা, বিলুপ্তির আশঙ্কা, পরাজয়ের গ্লানি—সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া গিয়াছিল। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অমারজনীর অবসানে উদয়াচলে অরুণচ্ছটার মত মহাযুদ্ধের পর দলিত-মথিত তুর্কীজাতির শীর্ষে দেখা দিলেন কামাল পাশা। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে তাঁহার

ন্যায় রণপণ্ডিত সেনাপতি বিরল; কুট রাজনীতিতেও তিনি অদ্বিতীয়। ইউরোপের বিশেষভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের ধ্বংসলীলা হইতে তিনি তুর্কীজাতির স্বাধীনতা যে অকুতোভয় দুঃসাহস, যে জ্বালাময় স্বদেশপ্রেম লইয়া রক্ষা করিয়াছেন—ইতিহাসে তাহা তাঁহার এক অনন্যসাধারণ কীর্ত্তি। তারপর দিনের পর দিন—মাস বৎসর ধরিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্য্যন্ত অতীতের সমস্ত আবর্জ্জনা দগ্ধ করিয়া, তিনি নূতন রাষ্ট্র, নূতন জাতি গড়িয়াছেন; নূতন আদর্শ নূতন আশায় সঞ্জাবিত তুর্কী জাতিকে তাহার পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। আশ্চর্য্য বিচিত্র ছিল তাঁহার চরিত্র; বিস্ময়কর ছিল তাঁহার আত্মপ্রত্যয় ও কর্ম্মক্ষমতা। তাঁহার জীবনচরিত দুরবগাহ। নীতিধর্ম্মের অনুশাসন-মুক্ত এই দুর্ব্বার জীবন স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতিতে ছিল অনুপ্রাণিত। আমিই তুর্কীজাতি একথা বলিবার স্পর্দ্ধা কেবল কামালেরই ছিল এবং তাহা অক্ষম ভাববিলাসীর অত্যুক্তি নহে। স্যালোনিকার কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর পুত্র কামাল—যিনি বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে পশুশালা পরিষ্কার এবং অশ্ব পরিচর্য্যা, মেষ পালন করিয়াছেন তিনিই ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া, তুর্কীজাতীর একমাত্র অবিসম্বাদী নিয়ন্তার পদ অধিকার করিয়াছিলেন।

অতীতের ধ্বংসস্তূপ সরাইয়া কত বিচিত্র আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়া কামাল নব্য তুর্কী গড়িয়াছেন—সেই সকল কথা আজ বারম্বার ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িতেছে। এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই এই বীরকেশরীর উত্থান, প্রতিষ্ঠা ও

পরিণতি আমরা লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার উগ্র এবং হিংস্র স্বদেশপ্রেম, তাঁহার গঠনমূলক অনন্যসাধারণ প্রতিভা, তাঁহার গৌরবময় জীবন হইতে আমরা দুর্ভাগ্য ভারতবাসী কতটুকু গ্রহণ করিয়াছি? পশ্চিম এশিয়ায় কামাল পাশা এক নূতন জাতি গঠন করিয়াছেন; আর আরবরাজ ইব্‌নে সাউদ নূতন আরব জাতি গঠন করিতেছেন। উভয়েই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতিকে ব্যর্থ করিয়াই জয়যুক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন আজ অস্তমিত হইলেন।

জাতীয়তা ও স্বাধীনতার সমুন্নতশির রাষ্ট্রগুরুকে হারাইয়া তুর্কী জাতি আজ বেদনায় বিহ্বল। নব্য তুরস্ক মহামানব আতাতুর্কের মহান সৃষ্টিকে বাহু ও মস্তিস্কবলে রক্ষা করিবে, তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিবে, এই আশা লইয়া আমরা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শূরবীরের উদ্দেশ্যে নতশিরে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তুর্কী জাতির অশ্রুর সহিত আমাদের অশ্রুর দীন অর্ঘ্য মিলিত করিতেছি।

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস্

রাষ্ট্রধর্ম্মে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করিয়া কামাল পাশা আঙ্গোরাতে যেদিন (১৯২৩) নব্যতুরস্কের সাধারণ-তন্ত্রের পতাকা উড়াইলেন, পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসে সেই দিনটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বাহিরের শত্রুকে সমূলে দমন করিয়া কামাল পাশার প্রথম ও প্রধান কার্য্য হইয়াছিল দেশের ও জাতির ঘরোয়া শত্রুদের দমন করা। কোরাণের উপদেশ

তাঁহাকে এবিষয়ে সাহায্য করে নাই। অস্ত্রের মুখেই তিনি গৃহশত্রুদের সমস্ত রকম বাধা প্রতিরোধ করিয়া এক অখণ্ড জাতীয়তার বেদীর উপর নব্যতুরস্ককে প্রতিষ্ঠিত করেন। সৈনিক হিসাবে তিনি যেমন নিজের দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সংস্কারক হিসাবেও তেমনি বহুযুগের ধর্ম্মান্ধতা বিনাশ করিয়া সমগ্র জাতিকে তিনি এক নূতন জীবনমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কোমলে-কঠিনে এমনই অসাধারণ ছিল কামালের ব্যক্তিত্ব যে, তাঁহার সংস্পর্শে নবীন তুরস্ক যুগান্তের অলসতা ও গোঁড়ামি এক কথায় পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন ও প্রাণবান জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

লীডার

কামালের মৃত্যুর পর সমগ্র তুরস্ক উত্তরাধিকারীসূত্রে আজ যে সম্পদের অধিকারী হইয়াছে তাহা হইল কামাল পাশার চরিত্রের অম্লান ও অনমনীয় মহত্ব। এই মহত্বের মণি-কোঠায় তিনি দেশ-মাতৃকার নবীন মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন—আজিকার তুরস্ক সেই মূর্ত্তির পূজার সঙ্গে সঙ্গে এই বীর কেশরীকে সর্ব্বদা সম্ভ্রমভরে স্মরণ করিবে। এবিষয়ে আজ সকলেই একমত যে, পুরাতনের জীর্ণ জঞ্জালের উপর কামাল নব্যতুরস্কের ভিত্তি স্থাপন করেন নাই। তুরস্কের জাতীয় চরিত্রের যে শৌর্য্য-ও বীর্য্য এবং মহত্ব ছিল, যাহা সুলতানের আমলে অন্ধতামসিকতা ও প্রাণহীণ ধর্ম্মের আচারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল—কামাল তাহারই উপর নব-জাতীয়তার উন্নত-শীর্ষ সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। নিজের ঝঞ্ঝাময় জীবনের এক একখানি অস্থি পঞ্জর

দিয়া এই সৌধের ভিত্তি-প্রস্তর তিনি স্থাপন করিয়াছেন। তাই কামালের নশ্বরদেহ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাইলেও, তাঁহার আদর্শ, ত্যাগ ও বিশুদ্ধ স্বদেশ-প্রেম চিরদিনই তাঁহার জাতির অন্তরে দেদীপ্যমান থাকিবে।

ন্যাশনাল কল্

নব্যতুরস্কে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং তাহার প্রথম সভাপতি ও অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইবার পর কামালের জীবনের উপর দিয়া দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। একটা জাতির জনগণ-চিত্তের অধিনায়ক হইবার দুর্লভ গৌরব অর্জ্জন করিবার পর এই দীর্ঘ বৎসর নরকেশরী কামাল কোমল উপাধানে মস্তক রাখিয়া শিথিল বিশ্রাসের অবসর অতি অল্পই পাইয়াছেন। মহাযুদ্ধের পর ছত্রভঙ্গ তুর্কজাতিকে নূতন করিয়া গড়িবার জন্য কী অমানুষিক পরিশ্রমই না তিনি করিতেন। আজ এই কর্ম্মক্লান্ত জীবন চিরনিদ্রার কোলে শান্তিলাভ করিয়াছে। বিংশশতকের এই পুরুষসিংহের মৃত্যুতে তুরস্কের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া পৃথিবীর সকল জাতিই সমস্বরে বলিতেছে—"কামাল চিরজীবি হউন।"

ট্রিবিউন

"জাতির ত্রাণকর্ত্তা"—ইহাই বোধকরি পরলোকগত কামাল-পাশার সম্বন্ধে প্রযুক্ত একমাত্র বিশেষণ। খিলাফত ও অকর্ম্মণ্য সুলতানের উচ্ছেদসাধন করিবার পর অনেকেই ভাবিয়াছিল যে এইবার কামালপাশা নিজেকে তুরস্কের সুলতান বলিয়া ঘোষণা

করিবেন। অবশ্য তাহা করিলে সমগ্র জাতি তাহাতে সায় দিত। কিন্তু কামালের আশৈশব লক্ষ্য ছিল –সিংহাসন নয়, সমগ্র জাতির উন্নতি। এই কামনার অনির্ব্বাণ শিখা অন্তরে লইয়াই তুরস্কের রাষ্ট্রনীতিতে তাঁহার আবির্ভাব। এবং জীবনের শেষদিনটি পর্য্যন্ত তিনি এই আদর্শ লইয়াই বাঁচিয়াছিলেন। "সাধারণতন্ত্রের আমি একজন সেবকমাত্র"—তাঁহার নিজমুখের এই উক্তিতেই তাঁহার মহত্ব প্রকাশ পায় এবং জীবনে তিনি যে আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করিয়া গিয়াছেন তাহারও মূলে ছিল এই আদর্শ।

বোম্বাই ক্রনিকেল

লুসান সন্ধির পরবর্ত্তি কালে তুরস্কের যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তাহাতে দেখিতে পাই সংস্কার ও ক্রমোন্নতির পথ দিয়া নব্যতুরস্ক সমগ্র পৃথিবীকে এক নূতন বিষয় শিক্ষা দিয়াছে। তাহা এই যে, যুদ্ধের জয়গৌরব অপেক্ষা শান্তির জয়গৌরব অধিক। এই ইতিহাসের পশ্চাতে যে বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল, যাঁহার আত্মবলিদানের কাহিনীতে এই ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় উজ্জ্বল তাঁহার নাম কামাল। সামরিক প্রতিভা ভিন্ন এই বীরপুরুষের গঠনমূলক প্রতিভা যে কি পরিমাণ ছিল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া সমগ্র ইউরোপ সেদিন সত্যই বিস্মিত হইয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীকে যদি আজ এক বৃহৎ মানব পরিবারের একটি সহর হিসাবে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কামাল পাশাকে ইহার একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিক হিসাবে শ্রদ্ধানিবেদন করিতে কাহারও কুণ্ঠা হইবে না।